لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ ঃ ৩১শে মে/১৫/৩০ শে জুন, ঃ ১৯৬৩ সন ঃ ২/৩/৪ সংখ্যা

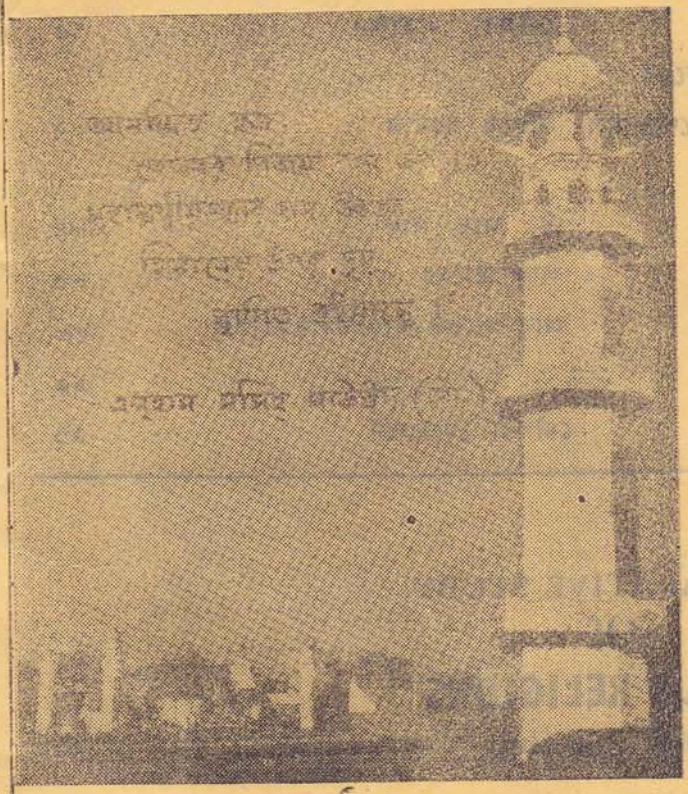

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক ঃ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲

প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১। খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর	হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)	..	২৫
২। ত্রিত্ববাদ	আহমদ তৌফিক চৌধুরী	....	৬৯
৩। পাকিস্তানে খ্রীষ্টানের সংখ্যা	.....	..	৭০
৪। যুগের মেহদী এসো	লতাফত হুসেন	...	৭১
৫। কবিকে সুসংবাদ	আবু আহমদ তবশির সেলবর্সী	...	৭৪
৬। পরকাল	মৌলবী মোহাম্মদ	..	৭৫
৭। বাত্যাবিধ্বস্ত এলাকায় সর্বহারাদের সাহায্যার্থে প্রাদেশিক মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া, পূর্ব পাকিস্তান।	সহিদুর রহমান	...	৮২
৮। আমেরিকার পত্র	এ, আর, খান	...	৮৪
৯। প্রতিবাদ	আবু তাহের	...	৮৬
১০। প্রার্থনা	আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসবাইল	...	৮৮
১১। খবর	.....	...	৮৯
১২। দরুদ পাঠের জরুরত	মৌলবী মোহাম্মদ	...	৯১

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ৩১শে মে / ১৫ই জুন : ১৯৬৩ সন : ২/৩ সংখ্যা

খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর

[আহ্‌মদীয়া জমাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এই পুস্তিকাখানি উর্দূতে ১৮৯৭ সনে রচিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার বহু সংস্করণ উর্দূ ও ইংরাজীতে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে এবং বহু দেশে অনেক ব্যক্তি ইহা দ্বারা ইস্‌লাম গ্রহণের তৌফিক পাইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, ইদানিং পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ইহার দ্বারা মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ সৃষ্টির অজুহাতে ইহাকে বাজেয়াপ্ত করেন। ফলে, পাকিস্তানের ও পৃথিবীর দূর দূর কোণ হইতে প্রতিবাদ মূলক অসংখ্য তার ও পত্র অবিরত সরকারের নিকট পৌঁছিতে থাকে এবং কোন কোন সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইতে থাকে।

আল্লাহ্-তা'লারই প্রাপ্য সম্যক প্রশংসা। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার তাঁহাদের ভুল ধরিতে পারিয়াছেন এবং বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশের দেড় মাসের মধ্যে ঐ আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। সে জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 'জাযা হুমুল্লাহ'।

পুস্তিকাখানির প্রথম প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত অনুবাদ মুকাররম মৌলবী মুহিবুল্লাহ্ সাহেব আমাদিগকে করিয়া দিয়াছেন। বাকী অংশের অনুবাদ আমরা করিয়াছি এবং উভয় অংশের তরজমা পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহ্মদীয়ার আমীর জনাব মৌলবী মুহাম্মদ সাহেব দেখিয়া দিয়াছেন।

আমরা আশা করি, ইসলাম, ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্ম সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নাবলীর তুলনা মূলক এই গবেষণা পাঠে প্রত্যেকেই উপকৃত হইবেন এবং উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, এই পুস্তিকায় পবিত্র প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম এবং যীশু সম্পর্কিত সমালোচনা আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস ও প্রচলিত বাইবেল অনুযায়ীই করিয়াছেন। এই যীশু কোরআন বর্ণিত 'ঈসাইবনে মরয়াম রসুলুল্লাহ্' হইতে পৃথক। কেননা তিনি বলেন ঃ

> "আমার আপত্তি সেই যীশুর সম্বন্ধে, যে ঈশ্বরেত্বের দাবী করে; নতুবা সেই পবিত্র নবীর সম্বন্ধে নহে, যাঁহার কথা কোরআনে সর্বোতঃ বর্ণিত হইয়াছে।"
>
> ('তব্লীগে রিসালাত', ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩২পৃঃ)
>
> "আমি সেই সত্য যীশুকে পবিত্র ও সম্মানিত বলিয়া জানি এবং মান্য করি, যিনি ঈশ্বরত্বের দাবী করেন নাই, ঈশ্বর-পুত্র হওয়ার দাবীও করেন নাই এবং যিনি হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আগমন সংবাদ দিয়াছিলেন ও তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।"
>
> ('নূরুল্-কোরআন', ২য় খণ্ড, ১৩ পৃঃ)

ভুল বুঝাবুঝি হইতে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এই উদ্ধৃতি দুইটি সহ আমরা এই অমূল্য পুস্তিকার এই বাংলা অনুবাদ পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আল্লাহ্-তা'লা ইহাকে সর্বোতঃ কল্যাণকর ও আশীষযুক্ত করুন।

'আমীন'!

অনন্তর, বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুরই সম্যক প্রশংসা।

—সম্পাদক, 'আহ্মদী']

সিরাজ উদ্দীন নামক এক জন খ্রীষ্টান লাহোর হইতে আমার নিকট চারিটি প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। জনসাধারণের উপকারার্থে উত্তর লিখিয়া প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি। এই জন্য উত্তর সহ চারিটি প্রশ্নই নিম্নে লিখা হইল।

প্রথম প্রশ্ন

খ্রীষ্টানদের মতে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতির সহিত প্রেম স্থাপন এবং উহার জন্য তাঁহার নিজ অস্তিত্বকে কোরবান (উৎসর্গ) করা। ইস্‌লাম ধর্ম প্রবর্তকের আগমনের উদ্দেশ্যে কি এই দুইটি বিষয়ের প্রকাশ আছে? অথবা প্রেম এবং কোরবানীর (আত্ম-উৎসর্গের) পরিবর্তে কি অপর কোন উত্তম শব্দের দ্বারা সেই উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করিতে পারেন?

উত্তর

প্রকাশ থাকে যে, এই প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্নকারীর প্রকৃত উদ্দশ্য মনে হইতেছে, খ্রীষ্টানদের মতে, যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এই জন্য আগমন করিয়াছিলেন যে, তিনি পাপীদের সহিত প্রেম স্থাপন করিয়া তাহাদের পাপের অভিশাপ স্বীয় মাথায় বহন করতঃ মৃত্যু বরণ করিবেন। পাপীদের উদ্ধারের জন্য কি এইরূপ অভিশপ্ত কোরবানীর নমুনা কোরআন পেশ করিয়াছে? যদি ইহা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোরআন মানবের জন্য ইহা হইতে কি কোন উত্তম মুক্তির পথ বলিয়া দিয়াছে? ইহার উত্তরে মিয়াঁ সিরাজুদ্দীন সাহেব মনে রাখিবেন যে, কোরআন এই ধরণের অভিশপ্ত কোরবানী পাপীদের মুক্তির জন্য পেশ করে না। বরং কোটি কোটি মানুষের পাপের বোঝা এক জনের ঘাড়ে দেওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির পাপও অপর এক ব্যক্তির ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া কোরআন ন্যায় সঙ্গত মনে করে না।

কোরানের স্পষ্ট উক্তি এই:—

لا تزر وازرة وزر اخرى

'একের পাপ অপের বহন করিবে না।' মুক্তির সমস্যা সম্বন্ধে কোরআনের বর্ণনার পূর্বে খ্রীষ্টানদের শিক্ষার এই নীতি বা মতবাদের ভ্রান্তি জন সাধারণের সামনে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিলাম, যেন এই সমস্যা সম্পর্কে যাঁহারা কোরআন ও ইঞ্জিলের মধ্যে তুলনা করিতে চাহেন, তাঁহারা সহজে তাহা করিতে পারেন।

অতএব, স্মরণ রাখিবেন যে, খ্রীষ্টানদের মতে খোদা-তা'লা পৃথিবীকে ভালবাসিয়া উহার মুক্তির জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, খোদাদ্রোহী, কাফের এবং পাপীদের পাপ স্বীয় প্রিয় পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন এবং পৃথিবী ক পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং অভিশপ্ত কাষ্ঠে লটকাইয়াছেন। ইহা সকল দিক দিয়াই মিথ্যা ও অমূলক এবং লজ্জাকর। যদি ন্যায় নীতির তুলাদণ্ডে

ওজন করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইহা 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে অন্যায়। এক জন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার শাস্তি এক নিরপরাধী ব্যক্তিকে দেওয়া মানবের বিবেক কখনও পছন্দ করিবে না। যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে পাপ তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলেও ইহা বাতিল বা অমূলক সাব্যস্ত হইবে। কেননা প্রকৃত পক্ষে পাপ এমন এক বিষ যে, উহা তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষ খোদা-তা'লার অবাধ্য হয় এবং খোদা-তা'লার উদ্দাম প্রেম এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ স্মরণ হইতে স্খলিত ও বঞ্চিত হয়। মাটি হইতে কোন উৎপাটিত বৃক্ষ যেমন রস শোষণ করিবার ক্ষমতা রাখে না এবং উহা দিন দিন শুকাইতে থাকে এবং অবশেষে বিবর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ যাহার মন খোদা-তা'লা হইতে উপড়াইয়া গিয়াছে, তাহারও অনুরূপ অবস্থা হয়। শুষ্কতার ন্যায় পাপও তাহার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। এই পাপরূপী শুষ্কতার প্রতিকার খোদা-তা'লার বিধানে তিন প্রকারে বর্ণিত আছে। (১) প্রেম। (২) 'এস্তেগ্‌ফার', যাহার অর্থ চাপা দেওয়া এবং ঢাকিয়া দেওয়ার আগ্রহ। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বৃক্ষের শিকড় মাটিতে গাড়া ও ঢাকা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা সজীবতার আশা রাখে। (৩) তৃতীয় বিধান হইল 'তাওবা'। জীবন বারি আকর্ষণ করার জন্য খোদা-তা'লার দিকে বিনম্রভাবে প্রত্যাবর্তন করা এবং নিজ স্বত্ত্বাকে তাঁহার নিকটবর্তী করা এবং সময়োপযোগী সৎ-কর্ম দ্বারা পাপের অন্তরাল হইতে নিজকে বাহির করা। 'তাওবা' শুধু মৌখিক নহে, বরং তাওবার' পূর্ণতা সৎকর্মের সহিত সংযুক্ত। যাবতীয় সৎকর্মই 'তাওবার' পূর্ণতার জন্য। সকল সৎকর্মের উদ্দেশ্যই খোদা-তা'লার নৈকট্য অর্জন করা। দোয়াও এক প্রকার 'তাওবা'। উহা দ্বারা আমরা খোদা-তা'লার নৈকট্য অন্বেষণ করি। এই জন্য খোদা-তা'লা প্রাণ সৃষ্টি করিয়া উহার নাম 'রূহ' রাখিয়াছেন। উহার প্রকৃত আনন্দ ও আরাম খোদা-তা'লার স্বীকৃতিতে এবং তাঁহার প্রেম ও তাঁহার আদেশ পালনে নিহিত এবং ইহার নাম 'নফস'[১] বলিয়াছেন। উহা খোদা-তা'লার সহিত ঐক্য সৃষ্টি করে। খোদা-তা'লার প্রতি প্রেমে মগ্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত বাগানের সেই বৃক্ষের ন্যায়, যাহার শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হইয়াছে। ইহাই মানুষের বেহেশ্‌ত। বৃক্ষ যে ভাবে মাটির রস শোষণ করে এবং নিজের মধ্যে টানিয়া লয় এবং উহার সাহায্যে আপন বিষাক্ত বায়ু বাহির করিয়া ফেলে, মানব মনের অবস্থাও তদ্রূপ। সে খোদা-তা'লার মহব্বতের পানি শোষণ করিয়া তাহার অন্তর হইতে বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিতে সক্ষম হয় এবং অতি সহজে সেই সব বিষাক্ত বস্তু দমন করে এবং খোদা-তা'লার মধ্যে বিলীন হইয়া সে পবিত্র পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে।

(১) অভিধানে 'নফস' বস্তুর স্বত্ত্বাকে বুঝায়

ফলে, তাহার আত্মা অত্যন্ত প্রশস্ত, সজীব ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়। কিন্তু খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সেই পুষ্টিসাধনকারী পানি আহরণ করিতে পারে না বলিয়া সে প্রতি মুহূর্তে শুষ্ক হইতে থাকে। অবশেষে, পত্র ঝরিয়া শুষ্ক ও বিরূপ দর্শন শাখার সমষ্টি মাত্র থাকিয়া যায়। পাপের শুষ্কতা সম্পর্কহীনতা হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া এই শুষ্কতার চিকিৎসা খোদা-তা'লার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা। প্রাকৃতিক বিধান ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই দিকে ইশারা করিয়া আল্লাহ্-তা'লা বলিতেছেনঃ

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى -

'হে খোদা-তা'লা হইতে শান্তি-প্রাপ্ত নফস্। তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব, তুমি আমার ভক্তগণের অন্তর্গত হও এবং আমার স্বর্গে প্রবেশ কর।"

ফল কথা, পাপ বিদূরিত করিবার এক মাত্র উপায় খোদা-তা'লার সহিত প্রেম ও ভালবাসা। সৎ-কর্মগুলি প্রেম ও ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা পাপের আগুনে পানি সিঞ্চন করে। কেননা মানুষ খোদা-তা'লার জন্য সৎ-কর্ম করিয়া তাহার প্রেমের প্রমাণ দেয়। খোদা-তা'লাকে এরূপভাবে মান্য করা, যেন তাঁহাকে প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়—এমন কি, স্বীয় প্রাণের উপরেও প্রাধান্য দেওয়া হয়—ইহাই প্রেমের প্রথম সোপান। ইহার দৃষ্টান্ত সেই বৃক্ষের, যাহা মাটীতে রোপণ করা হয়। ইহার পর, দ্বিতীয় সোপান 'এস্তেগ্-ফার' বা ক্ষমা প্রার্থনা, যাহার উদ্দেশ্য হইল খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব সুলভ দুর্বলতা প্রকাশ না পাওয়া। এই মার্গ বৃক্ষের সেই অবস্থার সহিত তুলনীয়, যখন উহা দৃঢ়ভাবে পূর্ণ মাত্রায় স্বীয় কাণ্ড মাটীতে প্রতিষ্ঠা করে। ইহার পর, তৃতীয় সোপান হইল 'তাওবা', যাহার তুলনা বৃক্ষের সেই অবস্থার সহিত যখন উহা স্বীয় কাণ্ড পানির নিকটবর্তী করিয়া শিশুর ন্যায় উহা শোষণ করিতে থাকে। বস্তুতঃ, পাপের দার্শনিক তত্ত্ব ইহাই যে, খোদা-তা'লা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যে উহার উৎপত্তি। অতএব, ইহা বিদূরিত করার উপায় খোদা-তা'লার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সহিত বিজড়িত। যাহারা কোন ব্যক্তির আত্ম-হত্যাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে করে, তাহারা কত বড় মূর্খ!

ইহা বড় মজার কথা যে, কোন ব্যক্তি অপরের মাথা ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য স্বীয় মাথায় পাথর মারে বা অপরকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আত্ম-হত্যা করে। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে এমন কোন বুদ্ধিমান নাই যে, এই জাতীয় 'আত্ম-হত্যাকে' মানবতার প্রতি 'সহানুভূতি' বলিবে। মানবতার প্রতি সহানুভূতি অবশ্য উত্তম কথা এবং অপরের

জন্য যাতনা সহ্য করা বড়ই বীরত্বের কাজ। কিন্তু ঐ সব যাতনা বহন করার পন্থা কি এই, যে ভাবে যীশুর সম্পর্কে বলা হয়? হায়! যদি যীশু নিজকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিতেন এবং অপরের শান্তির জন্য বুদ্ধিমানের ন্যায় কষ্ট ভোগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা অবশ্যই পৃথিবী উপকৃত হইত। যথা,—কোন গৃহহীন দরিদ্র ব্যক্তি যদি ঘরের কাজে মিস্ত্রি লাগাইতে সক্ষম না হয় এবং এমতাবস্থায় যদি কোন মিস্ত্রি তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া স্বয়ং কষ্ট স্বীকার করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে তাহার ঘর তৈরী করিয়া দেয়, তাহা হইলে অবশ্য সেই মিস্ত্রি প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। নিশ্চয়, সে এক দরিদ্রের গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়া তাহার প্রতি দয়া দেখাইয়াছে। কিন্তু যদি সে ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া দেখাইয়া আপন মাথায় পাথর মারিত, তাহাতে সেই অসহায় ব্যক্তির কি লাভ হইত? পরিতাপ! পৃথিবীতে খুব অল্প লোকই আছে, যাহারা পূর্ণ অনুশীলন ও দয়া প্রদর্শন বিষয়ে বুদ্ধিমানের পন্থা অবলম্বন করে। যীশু যদি সত্যই ইহা মনে করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন যে তাঁহার ঈদৃশ মরণে মানব জাতি মুক্তি পাইবে, তাহা হইলে তিনি কৃপার পাত্র এবং এই ঘটনা জগতের সামনে পেশ করার যোগ্য নহে, পরন্তু উহা গোপন করার যোগ্য।

যদি আমরা খ্রীষ্টানদের এই নীতিকে 'অভিশাপের' অর্থে যাচাই করি—যে ভাবে তাহারা যীশুর সম্পর্কে ইহা আরোপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে, তাহারা এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যীশুর প্রতি এরূপ বেআদবী করিয়াছে, যেরূপ বেআদবী পৃথিবীতে কোন জাতি তাহাদের নবীর প্রতি করে নাই। কারণ যীশুর অভিশপ্ত হওয়া, তিন দিনের জন্য হইলেও খ্রীষ্টানগণের ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ। যীশুকে অভিশপ্ত বলিয়া না ধরিলে খ্রীষ্টান ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং ক্রুশবাদ অসার হইয়া যায়। অভিশাপই যেন এই সব ধর্ম-বিশ্বাসের কড়ি-কাঠ! মানব জাতির ভালবাসার জন্য পৃথিবীতে যীশুর প্রেরণ এবং মানব জাতির জন্যই তাঁহার প্রাণ দানের কথা সমূহ খ্রীষ্টানদের ধারণা মতে এই কারণে উপযোগী যে, তাহারা বিশ্বাস রাখে যীশু পৃথিবীর আদি পাপের জন্য অভিশপ্ত হইয়াছেন এবং অভিশপ্ত কাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়াছেন। এই জন্যই আমরা পূর্বে সংকেত করিয়া আসিয়াছি যে, যীশু খ্রীষ্টের কোরবানী 'অভিশপ্ত কোরবানী'। 'পাপ' হইতে 'অভিশাপ' আসিয়াছে এবং অভিশাপ হইতে তিনি 'ক্রুশে বিদ্ধ' হইয়াছেন। এখন বিচার্য বিষয় হইল, অভিশাপের ছাপ কি কোন সত্যবাদীর উপর আরোপ করা যাইতে পারে? সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, খ্রীষ্টানগণ যীশুর প্রতি 'অভিশাপ' আরোপ করিয়া বড় ভুল করিয়াছে—যদিও উহা তিন দিনের জন্য, অথবা ইহা অপেক্ষা আরও অল্প সময়ের জন্য হউক না কেন। কারণ অভিশাপ এমন এক বিষয়, যাহা অভিশপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে

এবং কোন ব্যক্তিকে তখনই অভিশপ্ত বলা যায়, যখন তাহার অন্তঃকরণ খোদা হইতে একেবারে বিমুখ হইয়া তাঁহার শত্রু হইয়া যায়। এই জন্যই শয়তানকে 'লায়ীন' বা অভিশপ্ত বলা হয়। এই কথা কে না জানে যে, 'লানত' নৈকট্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াকে বলে। এই বাক্য সেই ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, যাহার অন্তঃকরণ খোদা-তা'লার প্রেম এবং 'এতায়াত' (বাধ্যতা) হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং প্রকৃত পক্ষে সে খোদা-তা'লার শত্রু হইয়া গিয়াছে। 'লানত' শব্দের তাৎপর্য ইহাই। অভিধান প্রণেতাগণ সকলেই এই বিষয়ে একমত। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, সত্যই যদি যীশু খ্রীষ্টের উপর অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে প্রকৃতই কি তিনি আল্লাহ্-তা'লার অভিশাপের পাত্র হইয়াছিলেন? খোদা-তা'লার 'মারেফাত' (তত্ত্বজ্ঞান), 'এতায়াত' (বাধ্যতা) এবং 'মহব্বত' (প্রেম) কি তাঁহার অন্তর হইতে চলিয়া গিয়াছিল? তিনি কি খোদার শত্রু এবং খোদা-তা'লাও তাঁহার শত্রু হইয়া গিয়াছিলেন? খোদা-তা'লাও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনিও খোদা-তা'লার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি? বস্তুতঃ 'লানতের' তাৎপর্য ইহাই। এইরূপ হইলে অবশ্য ইহা বুঝা যায় যে, তিনি অভিশপ্ত দিনগুলিতে প্রকৃতই কাফের, খোদা-তা'লা হইতে বিমুখ এবং খোদ-তা'লার শত্রু হইয়াছিলেন এবং শয়তানের অংশ তাঁহার মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়াছিল। যীশুর সমন্ধে এই জাতীয় বিশ্বাস পোষণ, নাউযুবিল্লাহ্, তাঁহাকে 'শয়তানের ভাই' বলার সমান। আমার বিশ্বাস, কোন সত্যবাদী নবী সম্পর্কে এই জাতীয় ধৃষ্টতা কোন খোদাভীরু মানুষ করিতে পারিবে না। একমাত্র দুষ্ট ও অপবিত্র লোকেরাই ইহা করিতে পারে।

অতএব, যখন যীশু খ্রীষ্টের আত্মা অভিশপ্ত হওয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে মানিয়া লইতে হইবে যেএই জাতীয় অভিশপ্ত কোরবানীও মিথ্যা। ইহা ভ্রান্ত ও অজ্ঞ লোকদের দ্বারা রচিত। যদি মুক্তি লাভের উপায় ইহাই হইয়া থাকে যে, প্রথমতঃ খ্রীষ্টকে শয়তান এবং খোদার শত্রু ও খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট সাব্যস্ত করা হউক, তাহা হইলে এরূপ মুক্তির উপর অভিশাপ। ইহা অপেক্ষা দোযখ বরণ করিয়া লওয়া খ্রীষ্টান-গণের জন্য উত্তম ছিল; কিন্তু তবুও আল্লাহ্র এক জন নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিকে "শয়তান" উপাধি দেওয়া উচিৎ হয় নাই। পরিতাপ! তাহারা কিরূপ অনর্থক ও অপবিত্র কথার উপর ভরসা করিয়া রহিয়াছে। এক দিক দিয়া তাহারা তাঁহাকে খোদার পুত্র, খোদা হইতে উদ্ভূত এবং খোদা-তা'লার সহিত মিলিত মনে করে এবং অপর দিকে তাহারা তাঁহাকে 'শয়তান' উপাধি দেয়। কারণ, 'লানত' অর্থাৎ অভিশাপ 'শয়তানের' সহিত সংশ্লিষ্ট এবং 'লাইন,' শয়তানের নাম। 'লানতী' বা 'অভিশপ্ত' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শয়তান হইতে উদ্ভূত, শয়তানের সহিত মিলিত এবং নিজে শয়তান। সুতরাং, খ্রীষ্টানদের মতে

যীশুর মধ্যে দুই প্রকারের ত্রিত্ববাদ পাওয়া যায়—'রহ্‌মানী' ও 'শয়তানী'। নাউযুবিল্লাহ্‌, যীশু শয়তানের অন্তর্গত হইয়া শয়তানের মধ্যে নিজকে বিলীন করিয়া এবং লানতের দ্বারা শয়তানের অংশ নিজের মধ্যে লইয়া তিনি খোদার অবাধ্য, ও খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া খোদার শত্রু হইয়াছিলেন!

মিয়াঁ সিরাজদ্দীন! বিচারের সহিত বলুন। এই মিশন, যাহা খ্রীষ্টের প্রতি আরোপ করা হয়, উহার মধ্যে কি কোন আধ্যাত্মিক বা নৈতিক পবিত্রতা আছে? পৃথিবীতে কি ইহা অপেক্ষা জঘন্য কোন বিশ্বাস আছে, যাহাতে নিজের মুক্তির জন্য কোন খোদা প্রেমিককে খোদার শত্রু এবং খোদা-দ্রোহী ও শয়তান সাব্যস্ত করা হয়? খোদা-তা'লা যিনি সর্বশক্তিমান, অনন্ত করুণাময় এবং দয়াময়, তাঁহার এই লানতী কোরবানীর কি অবশ্যক ছিল? এই মতবাদকে যখন আর এক দিক দিয়া যাচাই করা যায় যে, এই 'লানতী কোরবানীর' শিক্ষা ঈহুদীদিগণকেও কি দেওয়া হইয়াছিল, তখন এই মিথ্যার বেশাতি আরও পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য যদি খোদা-তা'লার হাতে এক মাত্র এই উপায়ই ছিল যে, তাঁহার এক পুত্র হইবেন এবং তিনি সমস্ত পাপীর লানত আপন স্কন্ধে বহন করিয়া অভিশপ্ত কোরবানী হইয়া ক্রুশে আরোহণ করিবেন, তাহা হইলে তৌরীতে এবং অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থ ইহুদীদের হাতে আছে, ঐলিগুতে এই অভিশপ্ত মৃত্যুর উল্লেখ থাকা আবশ্যক ছিল। কোন বিবেক-সম্পন্ন মানুষ ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না যে, মানব জাতির মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌-তা'লার চিরস্থায়ী নির্ধারিত নিয়ম সব সময়ই পরিবর্তনশীল। ইহা কখনই হইতে পারে না যে, তৌরীতের যুগে তাহা এক প্রকার, আবার ইঞ্জিলের যুগে অন্য প্রকার এবং কোরআনের যুগে আর এক প্রকার ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের নবীগণের যুগে অন্য প্রকার ছিল। আমরা তৌরীত এবং ইহুদীদের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ভালভাবে গবেষণা করিলে দেখিতে পাই যে, উহাদের কোনটির মধ্যে এই 'লানতী মৃত্যুর' শিক্ষা নাই। আমরা ইদানিং বহু বড় বড় বিদ্বান ইহুদী পণ্ডিতের নিকট পত্র যোগে খোদা-তা'লার শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মানব জাতির মুক্তির জন্য তৌরীত এবং অন্যান্য ধর্মপুস্তকে তাঁহাদিগকে কি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে? ঐ সব গ্রন্থে খোদার পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত ও তাহার কোরবানীর প্রতি ইমান রাখার শিক্ষা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে কি? উত্তরে তাঁহারা জানাইয়াছেন, "মুক্তি সম্পর্কে তৌরীতের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে কোরআনেরই অনুরূপ। অর্থাৎ, খোদা-তা'লার দিকে পূর্ণ প্রত্যাবর্তন, পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং প্রবৃত্তির তাড়না হইতে দূরে থাকিয়া খোদা-তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পুণ্য কর্ম করা এবং তাঁহার নির্দিষ্ট সীমা, বিধান, আদেশ ও নির্দেশাবলী খুব দৃঢ়তা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত পালন করা। ইহাই মুক্তির উপায়।

ইহাই পুনঃ পুনঃ তৌরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। খোদা-তা'লার পবিত্র নবীগণ মানব জাতিকে ইহারই উপর আমল করাইয়া আসিয়াছেন এবং ইহা পরিত্যাগ করার জন্য শাস্তিও অবতীর্ণ হইয়াছে।". উক্ত বিজ্ঞ-মণ্ডলী পত্রে শুধু বিস্তারিত উত্তর দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহারা বিখ্যাত বিজ্ঞজন লিখিত প্রসিদ্ধ বেনজীর পুস্তকাবলী আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। ঐ সকল পুস্তক ও পত্রাদি আমার নিকটে আছে। ঐ সকল প্রমাণ একটি বিস্তারিত পুস্তকে আমি সংকলন করার ইচ্ছা রাখি। যে কেহ দেখিতে চান, আমি তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারি।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিচার ও পরিষ্কার মন নিয়া চিন্তা করা উচিত, যদি ইহা সত্য হইত যে, খোদা-তা'লা যীশু খ্রীষ্টকে আপন পুত্র সাব্যস্ত করিয়া এবং অপরের অভিশাপ তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া এই অভিশপ্ত কোরবানীকে মানব জাতির মুক্তির কারণ করিয়াছেন এবং এই শিক্ষাই ইহুদীগণ পাইয়াছেন, তাহা হইলে এই শিক্ষা ইহুদীগণ আজ পর্যন্ত গোপন রাখিবার কারণ কি এবং এই শিক্ষার বিরুদ্ধে তাহাদের চির শত্রুতার কারণ কি? এই আপত্তি আরও শক্তিশালী হয়, যখন আমরা দেখি যে ইহুদীগণের শিক্ষা পুনর্জীবিত করিবার জন্য পর পর নবীগণেরও আবির্ভাব হইয়াছিল এবং হযরত মুসা আলাইহেস্ সালামও কয়েক লক্ষ লোকের সামনে তৌরীতের শিক্ষা বর্ণনা করিয়াছিলেন। অতএব, ইহা কিরূপে সম্ভব পর যে, ইহুদীগণ যে শিক্ষা পর পর নবীগণের দ্বারা পাইয়া আসিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে? পরন্তু তাহাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যেন খোদা তা'লার আদেশ ও নির্দেশাবলী তাহাদের ঘরের দুয়ারে চৌকাঠে এবং আস্তিনে লিপিবদ্ধ করে, শিশুদিগকে শিক্ষা দেয় এবং নিজেরা কণ্ঠস্থ করে। এ কথা কি কেহ অনুধাবন করিতে পারে, অথবা কোন পবিত্র বিবেক সাক্ষ্য দিতে পারে যে, এত প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইহুদীগণ সেই উত্তম শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছে, যাহার উপর তাহাদের মুক্তি নির্ভর করিতেছিল। ইহুদীগণ আজ নয়, বহু দিন হইতে মুক্তি সম্পর্কে একই কথা বলিয়া আসিতেছে। সুতরাং, পবিত্র কোরআনের নযুলের সময় তাহারা এই সাক্ষ্য দিয়াছে এবং আজও তাহারা এই সাক্ষ্য দিতেছে। এই সম্পর্কে তাহাদের প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি আমার নিকট আসিয়াছে। যদি ইহুদীগণের মুক্তির জন্য এই 'অভিশপ্ত কোরবানী' শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা হইলে কোন কারণই দেখি না যে, তাহারা কেন এই শিক্ষা গোপন করিয়া রাখিয়াছে? অবশ্য, যীশু খ্রীষ্টকে তাহারা 'খোদার পুত্র' বলিয়া না মানিতে পারিত এবং তাঁহার ক্রুশ বিদ্ধ হওয়াকে প্রকৃত পুত্রের ক্রুশ বলিয়া না মানিতে পারিত এবং বলিতে পারিত যে, যে পুত্রের কোরবানী দ্বারা পৃথিবী মুক্তি লাভ করিবে —তিনি এই ব্যক্তি নহেন। তিনি ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে আগমন করিবেন। কিন্তু

ইহা কখনই সম্ভবপর ছিল না যে, ইহুদীগণের সকল ফেরকা এক যোগে সেই শিক্ষাকে অস্বীকার করে, যাহা তাহাদের ধর্ম-গ্রন্থে বিরাজমান এবং খোদা-তা'লার পবিত্র নবীগণ যাহা সঞ্জীবিত করিয়া আসিতেছিলেন। ইহুদী জাতি আজও আছে এবং তাহাদের মধ্যে আলেম ফাযেলও বিদ্যমান। তাহাদের ধর্মগ্রন্থরাজিও বিদ্যমান। যদি এ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে সে যেন সরাসরি তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তাহার কি এ বিষয়ে ইহুদীদের সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক নয়? ইহুদীগণ কি এ বিষয়ে প্রথম সাক্ষী নহে? তাহারা শত শত বৎসর হইতে তৌরীত মুখস্ত করিয়া আসিতেছে। এক জন দুর্বল মানুষকে খোদারূপে খাড়া করার বিষয়ে পূর্ববর্তী শিক্ষার সাক্ষ্য নাই, উহার উত্তরাধিকারীদেরও সাক্ষ্য নাই। পরবর্তী শিক্ষার সাক্ষ্য নাই এবং বিবেকেরও সাক্ষ্য নাই। তাহাকে 'খোদার'ও বলা এবং 'শয়তানের'ও বলা, এরূপ অপবিত্র বিবেক বহির্গত কথা সমূহ বিশ্বাস করা কি পবিত্র প্রাকৃতির লোকের লোকের কাজ?

পুনরায় এই বিশ্বাসকে আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে প্রশ্ন জাগে যে, ইহা দ্বারা তৌরীতের উত্তরাধিকারও পুরাতন শিক্ষার বিরোধিতা করিয়া, এক জনের পাপ অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া এবং এক জন সত্যবাদীর হৃদয়কে অভিশপ্ত ও খোদা হইতে দূর, পরিত্যক্ত ও শয়তানের অনুরূপ বলিয়া সাব্যস্ত করিবার পর এই সকল দোষক্রটি সম্বলিত 'অভিশপ্ত প্রায়শ্চিত্তবাদ' দ্বারা বিশ্বাসীদের কি উপকার হইয়াছে? তাহারা কি পাপ হইতে বিরত হইয়াছে, বা তাহাদের পাপের কি ক্ষমা হইয়াছে? ইহাতে এই ধর্ম বিশ্বাসের আরও আরও অসারতা প্রতিপন্ন হয়। কারণ পাপ হইতে বিরত থাকা এবং পবিত্রতা অর্জন, জাজ্বল্যমান ঘটনার বিপরীত কথা। খ্রীষ্টানদের ধারণা মতে হযরত দাউদ (আঃ)-ও যীশুর 'প্রায়শ্চিত্তবাদের' প্রতি বিশ্বাস রাখিতেন। কিন্তু তাহাদের কথামত দাউদ (আঃ) ইমান আনা সত্ত্বেও নাউযুবিল্লাহ্ এক জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছিলেন এবং প্রবৃত্তি চরিতার্থের কাজে খেলাফতের খাজানা হইতে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।[১] তিনি এক শত পর্যন্ত বিবাহ করিয়াছিলেন ও শেষ জীবন পর্যন্ত এই পাপে

(১) "দায়ূদের মহাপাপের বিবরণ" শীর্ষ দিয়া ২ 'শমূয়েল,' ১১ অধ্যায়ে, লিখিত আছে:—

"একদা বৈকালে দায়ূদ শয্যা হইতে উঠিয়া রাজবাটীর ছাদে বেড়াইতেছিলেন, আর ছাদ হইতে দেখিতে পাইলেন যে একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে; স্ত্রীলোটি দেখিতে বড়ই সুন্দরী ছিল। দায়ূদ তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইলেন। এক জন কহিল, এ কি ইলিয়ামের কন্যা, হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রী বৎশেবা নয়? তখন

দায়ুদ দূত পাঠাইয়া তাহাকে আনাইলেন, এবং সে তাঁহার নিকটে আসিলে দায়ুদ তাহার সহিত শয়ন করিলেন; সে স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া শুচি হইয়াছিল। পরে সে আপন ঘরে ফিরিয়া গেল; পরে সে স্ত্রী গর্ভবতী হইল; আর লোক পাঠাইয়া দায়ুদকে এই সমাচার দিল, আমার গর্ভ হইয়াছে।

'তখন দায়ুদ যোয়াবের ('রব্বা' নগর অবরোধ লিপ্ত সেনাপতি—সঃ আঃ) নিকটে লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন, হিত্তীয় উরিয়কে আমার নিকটে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে উরিয়কে দায়ুদের নিকটে যোয়াব পাঠাইলেন। উরিয় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে দায়ুদ তাহাকে যোয়াবের কুশল, লোকদের কুশল ও যুদ্ধের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে দায়ুদ উরিয়কে কহিলেন, তুমি আপন বটিতে গিয়া পা ধোও। তখন উরিয় রাজবাটী হইতে বাহির হইল, আর রাজার নিকট হইতে তাহার পশ্চাতেপশ্চাতে ভেট গেল। কিন্তু উরিয় আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে রাজবাটীর দ্বারে শয়ন করিল, ঘরে গেল না। পরে এই কথা দায়ুদকে বলা হইল যে, উরিয় ঘরে যায় নাই। দায়ুদ উরিয়কে কহিলেন, তুমি কি পরিভ্রমণ করিয়া আইস নাই? তবে কেন বাটীতে গেলে না? উরিয় দায়ুদকে কহিল, সিন্দুক, ইস্রায়েল ও যিহূদা কুটিরে বাস করিতেছে, এবং আমার প্রভুর দাসগণ খোলা মাঠে ছাউনী করিয়া আছেন; তবে আমি কি ভোজন পান করিতে আপন গৃহে যাইতে পারি? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি এমন কর্ম্ম করিব না। তখন দায়ুদ উড়িয়কে কহিলেন, অদ্যও তুমি এই স্থানে থাক, কল্য তোমাকে বিদায় করিব। তাহাতে উরিয় সে দিবস ও পর দিবস যিরূশালেমে রহিল। আর দায়ুদ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলে সে তাঁহার সাক্ষাতে ভোজন পান করিল; আর তিনি তাহাকে মত্ত করিলেন; কিন্তু সে সন্ধ্যাকালে আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে আপন শয্যায় শয়ন করিবার জন্য বাহিরে গেল, ঘরে গেল না। প্রাতঃকালে দায়ুদ যোয়াবের নিকটে এক পত্র লিখিয়া উরিয়ের হাতে পাঠাইলেন, পত্রখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তোমরা এই উরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে উহার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাও, যেন এ আহত হইয়া মারা পড়ে। পরে কোন্ স্থানে বিক্রমশালী লোক আছে, তাহা জানাতে যোয়াব নগর অবরোধ-কালে সেই স্থানে উরিয়কে নিযুক্ত করিলেন। পরে নগরস্থ লোকেরা বাহির হইয়া যোয়াবের সহিত যুদ্ধ করিলে কয়েক জন লোক, দায়ুদের দাসগণের মধ্যে কয়েকজন, পতিত হইল, বিশেষতঃ হিত্তীয় উরিয়ও মারা পড়িল।" [ঐ ২—১৭ পদ]

"আর উরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামী উরিয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া স্বামীর জন্য শোক প্রকাশ করিল। পরে শোক অতীত হইলে দায়ুদ লোক পাঠাইয়া তাহাকে আপন বাটীতে আনাইলেন, তাহাতে সে তাঁহার স্ত্রী হইল, ও তাঁহার জন্য পুত্র প্রসব করিল। কিন্তু দায়ুদের কৃত এই কর্ম্ম সদা প্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হইল।" [ঐ,২৬-২৫ পদ]

'মথি' লিখিত 'সুসমাচারের' প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পদটিই হইতেছে:—

"যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলী-পত্র, তিনি দায়ুদের সন্তান, আব্রাহামের সন্তান।"

'বাইবেলে' দায়ুদের যে চরিত্র অঙ্কিত, ইহাতে তাঁহার বংশে যীশুখ্রীষ্ট "ঈশ্বর পুত্র" যে উপযুক্ত 'অভিশপ্ত প্রায়শ্চিত্ত', সন্দেহের কিছুই নাই। —সঃ আহমদী]

নিমজ্জিত ছিলেন এবং প্রতি দিন অন্যায় পাপে লিপ্ত থাকিতেন। অতএব, যীশুর অভিশপ্ত কোরবানী যদি মানুষকে পাপ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের কথা মত দাউদ (আঃ) এইভাবে পাপে নিমগ্ন থাকিতেন না। এইভাবে যীশুর তিন নানী ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন।[১] অতএব, ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যদি যীশুর অভিশপ্ত কোরবানীর প্রতি ইমান আনিলে অন্তরের শুচিতা লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার নানীরা নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস দ্বারা উপকৃতা হইতেন এবং এইভাবে লজ্জাকর কাজে লিপ্তা হইতেন না।

---

(১) 'মথি' প্রথম অধ্যায়ে 'যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলী-পত্রে' 'তামর', 'রাহব' ও 'উরিয়ের বিধবা' (বৎসেবা) মাতৃ কুল প্রধানা ত্রি-নারীর নাম বর্ণিত আছে। ['মথি, ১ম অধ্যায়, ৩, ৫ ও ৬ পদ] 'বাইবেলের পুরাতন বিধানে' (Old testaments এ) এই তিন নারীই ভ্রষ্টা ও ব্যাভিচারিণী হওয়া লিখিত আছে।

১। 'রাহব' সম্বন্ধে 'যিহোশূয়', ২য় অধ্যায়, ১ম পদে লিখিত আছে: "তখন তাহারা রাহব নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে শয়ন করিল।"

২। 'তামর' সম্বন্ধে 'আদি পুস্তক', ৩৮ অধ্যায়, ১৫-১৯ পদে লিখিত আছে যে, শ্বশুরের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল:—

"পরে যিহূদা তাহাকে দেখিয়া বেশ্যা মনে করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল। অতএব, সে পুত্রবধূকে চিনিতে না পারাতে পথের পার্শ্বে তাহার নিকটে গিয়া কহিল, আইস, আমি তোমার কাছে গমন করি। তামর কহিল, আমার কাছে আসিবার জন্য আমাকে কি দিবে? সে কহিল, পাল হইতে একটি ছাগ বৎস পাঠাইয়া দিব। তামর কহিল, যাবৎ তাহা না পাঠাও, তাবৎ আমার কাছে কি কিছু বন্ধক রাখিবে? সে কহিল, কি বন্ধক রাখিব? তামর কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্টি। তখন সে তাহাকে সেইগুলি দিয়া তাহার কাছে গমন করিল; তাহাতে সে তাহা হইতে গর্ভবতী হইল।"

৩। 'উরিয়ের বিধবা' ('বৎসেবা') সম্বন্ধে ২ শামূয়েল, ১১ অধ্যায় হইতে "দায়ূদের মহাপাপ" সংক্রান্ত উদ্ধৃতি আমরা দিয়াছি। ৩-৪ পদ দ্রষ্টব্য।

এই সমস্ত আদি পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যীশুর 'অভিশপ্ত কোরবানী' তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বর পুত্র হওয়ার উপযুক্ত দলীল বটে।

—সঃ 'আহ্‌মদী'।

যীশুর শিষ্যগণও ইমান আনার পর লজ্জাকর পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা ত্রিশ টাকায় যীশুকে বিক্রয় করিয়াছিল। পিতরও যীশুর সামনে দাঁড়াইয়া তিন বার তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিয়াছিল।[১] প্রকাশ থাকে যে, নবীকে অভিশাপ দেওয়া ভীষণ পাপ। আজকাল ইউরোপে মদ্যপান ও ব্যভিচারের তুফান যেভাবে প্রবাহিত, তাহা লিখার প্রয়োজন নাই। কয়েক জন সম্মানিত পাদ্রী সাহেবের ব্যভিচারের কাহিনী ইউরোপের সংবাদ পত্রের হাওয়ালা দিয়া আমার প্রকাশিত কোন প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি। এই সব ঘটনাবলী দ্বারা পূর্ণভাবে ইহা সাব্যস্ত হয়, এই 'অভিশপ্ত কোরবানী' পাপ রোধ করিতে পারে নাই।

এই বিষয়ের আর এক দিক হইল, যদি এই 'অভিশপ্ত কোরবানী' পাপ রোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে কি ইহা দ্বারা চির কাল পাপের ক্ষমা হইতে থাকিবে। ইহা যেন পাপ খণ্ডনের এমন একটি ব্যবস্থাপত্র, যদ্দারা এক দুরাচার অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিয়া, চুরি করিয়া বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, কাহারও সম্পদ ও সম্মান নষ্ট করিয়া, অথবা কাহারও অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়া অভিশপ্ত কোরবানীর উপর বিশ্বাস আনিয়া খোদার বান্দাদের অধিকার নষ্ট করিতে পারে। এইভাবে কোন ব্যক্তি সদা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিয়া এক মাত্র 'লানতী কোরবানীতে' বিশ্বাস রাখার ফলে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। অতএব, ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা কখনও হইতে পারে না। পরন্তু এইভাবে পাপ করিয়া অভিশপ্ত কোরবানীর আশ্রয় গ্রহণ করা বদমায়েশী পন্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনে হয়, পৌলের মনেও কম্পন আরম্ভ হইয়াছিল যে, এই বিধান ঠিক নহে। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, "যীশুর কোরবানী প্রথম পাপের জন্য এবং যীশু দ্বিতীয় বার ক্রুশে মারিতে পারেন না।" কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি বড় বিপদে পড়িয়া গিয়াছেন। কেননা এই কথা যদি ঠিক হয় যে, যীশুর অভিশপ্ত কোরবানী প্রথম বারের পাপের জন্য, তাহা হইলে দাউদ নবী নাউযুবিল্লাহ্ চিরস্থায়ী দোযখের উপযুক্ত। কারণ খ্রীষ্টানদের কথা মত তিনি হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পর খোদা-তা'লার অনুমতি ছাড়া তাহাকে চির দিন তাঁহার ঘরে রাখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দাউদ (আঃ) এক শত বিবাহ করিয়াছিলেন, যাহা খ্রীষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাসানুযায়ী তাঁহার জন্য বৈধ ছিল না। অতএব, ইহা তাঁহার জন্য প্রথম পাপ রহিল না। পরন্তু উহা বার বারই অনুষ্ঠিত হইতে থাকিল এবং প্রত্যেক দন উহা নূতন করিয়া পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল। যখন 'অভিশপ্ত কোরবানী' পাপ রোধ করিতে পারে না, তখন সাধারণ খ্রীষ্টানদের দ্বারাও নিশ্চয়ই পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং এখনও হইতেছে। অতএব, পৌলের নীতি অনুযায়ী দ্বিতীয় (বারের) পাপ ক্ষমার যোগ্য

(১) মথি, ২৬ঃ ১৪—১৬; ৪৭—৫০; ৫৬; ৬৯—৭৪ পদ। —সঃ আঃ

নহে, এবং চিরস্থায়ী দোযখ ইহার শাস্তি।[১] এই হিসাবে কোন খ্রীষ্টানই চিরস্থায়ী দোযখ হইতে মুক্তি পাইবার যোগ্য সাব্যস্ত হয় না। মিয়াঁ সিরাজ উদ্দীনকে দূরে যাইতে হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি নিজের অবস্থাই দেখুন। প্রথমে তিনি মরিয়মের পুত্রকে খোদর পুত্র স্বীকার করিয়া অভিশপ্ত কোরবানীর 'বাপ্ত ইজ' পাইয়াছিলেন। পরে কাদিয়ান আসিয়া নূতন করিয়া তিনি নূতনভাবে মুসলমান হন এবং স্বীকার করেন যে, অভিশপ্ত কোরবানীর অসারতা তিনি পূর্ণভাবে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন এবং উক্ত বিশ্বাসকে তিনি ভ্রান্ত মনে করেন। কিন্তু কাদিয়ান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আবার পাদ্রীদের ফাঁদে পড়িয়া খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেন। এখন মিয়াঁ সিরাজ উদ্দীন নিজেই চিন্তা করুন যে, প্রথম বার 'বাপ্তাইজ' পাইবার পর তিনি খৃষ্টান ধর্ম হইতে ফিরিয়া কথা ও কাজে উহার বিরোধিতা করেন। ইহা খৃষ্টান নীতি অনুযায়ী এক মহাপাপ ছিল, যাহা দ্বিতীয় বার তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। অতএব, পৌলের কথানুসারে এই পাপ কখনও খণ্ডন হইবে না। কারণ, ইহার জন্য দ্বিতীয় বার ক্রুশীয় মৃত্যুর প্রয়োজন।

যদি এই কথা বলেন যে, পৌল ভুল করিয়াছে বা মিথ্যা বলিয়াছে এবং প্রকৃত কথা এই যে, 'অভিশপ্ত কোরবানীর' প্রতি ইমান আনিলে কোন পাপ পাপ থাকে না এবং চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, মিথ্যা বলা, আমানত খেয়ানত করা, বা যে কোন প্রকারের পাপাই হউক না কেন—উহার কোন শাস্তি হইবে না, তাহা হইলে ইহা এক অপবিত্রতা প্রসারকারী ধর্ম হইবে। যাহারা এই জাতীয় বিশ্বাস রাখে, তাহাদিগের নিকট হইতে সমসাময়িক সরকারের জমানত গ্রহণ করা কর্তব্য। পুনরায় যদি এই ধারণা পেশ করেন যে, 'অভিশপ্ত কোরবানীর' প্রতি ইমান আনয়নকারী সত্যিকারের শুদ্ধি অর্জন করে এবং পাপ হইতে পবিত্র হয়, তাহা হইলে জানা প্রয়োজন ইহার উত্তর আমি পূর্বেই দিয়াছি যে, ইহা কখনও ঠিক নহে। আমি ইতিপূর্বেই দাউদ নবীর পাপ, যীশুর নানীদের পাপ এবং পাদ্রী সাহেবদের পাপের কথা উল্লেখ করিয়াছি। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, আজকাল

---

(১) "আর যেমন মানুষের নিমিত্ত এক বার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে, তেমনি খ্রীষ্টও 'অনেকের পাপ-ভার তুলিয়া লইবার' নিমিত্ত এক বার উৎসৃষ্ট হইয়াছেন।" [ইব্রীয় ৯ : ২৭-২৮]

"কারণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাইলে পর যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক পাপ করি, তবে পাপার্থক আর কোন যজ্ঞ অবশিষ্ট থাকে না, কেবল থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত অগ্নির চণ্ডতা।" [ইব্রীয়, ১০ : ২৬-২৭]

ইউরোপ পাপ কাজে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কাহারও পবিত্র জীবনের উদাহরণ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার প্রমাণ কি যে তাহার জীবন পবিত্র? অনেক বদমায়েশ, হারাম ভক্ষণকারী, নির্লজ্জ ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, খোদাকে অস্বীকারকারী বাহ্যতঃ পবিত্র জীবন দেখাইতে পারে, কিন্তু অভ্যন্তরে ঐ সকল ব্যক্তির জীবন একটি কবরের ন্যায়, যাহার মধ্যে পুতিগন্ধময় মূর্দা লাশ এবং নর-কঙ্কাল ব্যতীত আর কিছুই নাই।

এই ধারণা করাও অন্যায় যে, কোন জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাভাবিকভাবে পবিত্র, বা সকলেই স্বাভাবিকভাবে বদমায়েশ। বরং আমরা দেখি যে, আল্লাহ্-তা'লার বিধান প্রত্যেক জাতিকেই এই দাবী করিবার অধিকার দিয়াছে যে, যেভাবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবতঃ অশিষ্ট, কদাচারী এবং অন্যের অকল্যাণকামী, তেমনি তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ হৃদয়বান সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট, সদাচারী এবং পরহিতকামী ভাল লোকও আছেন। এই বিধান হইতে কোন হিন্দু, পার্সী, ইহুদী, শিখ, বৌদ্ধ—এমন কি, ডোম এবং চণ্ডালও বহির্গত নহে। যতই লোক সততা ও ভদ্রতার দিকে অগ্রসর হয়, এবং জাতির মধ্যে সমষ্টিগতভাবে জ্ঞান, সম্মান এবং আত্ম-মর্যাদার রঙ্গ ধারণ করে, ততই তাহাদের সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পবিত্র জীবন এবং উত্তম চালচলনে খ্যাতি অর্জন করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের উত্তম আদর্শ বৈশিষ্ট্যের আলোক প্রকাশ করিতে থাকেন। যদি সকল জাতির মধ্যে স্বাভাবিক সততার গুণ না থাকিত, তাহা লইলে ধর্ম পরিবর্তনের দ্বারাও উক্ত গুণ জন্মান সম্ভব হইত না। কারণ, খোদার তৈরী স্বভাবের মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। যদি প্রকৃত সত্যের জন্য কাহারও ক্ষুধা ও পিপাসা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মানিয়া থাকিতে হইবে যে, ধর্মের অস্তিত্বের পূর্বেই মানব প্রকৃতির মধ্যে খোদা-তা'লার ঈদৃশ স্বভাবজাত গুণের বণ্টন হইয়া গিয়াছে। কাহারও স্বভাবে ধৈর্য ও প্রেমের প্রাধান্য এবং কাহারও স্বভাবে কঠোরতা ও ক্রোধের, প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, সেই প্রেম, আনুগত্য, সাধুতা এবং বিশ্বস্ততা, যাহা সৃষ্টমূর্তি বা মনুষ্য পূজার কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহা যেন সেখানে ব্যয় না করিয়া খোদার কাজে ব্যয় করা হয়। মানবীয় শক্তি নিচয়ের উপর ধর্মের প্রভাব কি, ইঞ্জিলে ইহার কোন উত্তর নাই। ইঞ্জিল জ্ঞানের পথ হইতে দূরে। কিন্তু কোরআন শরীফ পুনঃ পুনঃ বিস্তারিত বর্ণনার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ধর্মের এই অধিকার নাই যে, মানুষের মধ্যে প্রদত্ত স্বভাবের উহা পরিবর্তন ঘটায় এবং নেকড়ে বাঘকে ছাগল বলিয়া দেখায়। ধর্মের চরম উদ্দেশ্য হইল, সেই সব শক্তি যাহা মানব স্বভাবে রহিয়াছে ঐগুলি স্থান ও কাল উপযোগী কাজে লাগাইতে, প্রদর্শন করা। ধর্মের এই শক্তি নাই যে, কাহারও স্বভাব-জাত

গুণের পরিবর্তন ঘটায়। উহার শুধু এই অধিকার আছে, যে কোন গুণকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ দেয়। একটি মাত্র গুণ, যথা,—দয়া ও ক্ষমার প্রতিই যেন জোর না দেয়, বরং যাবতীয় বৃত্তিগুলিকেই কাজে লাগাইবার জন্য উপদেশ দেয়। কারণ, মানুষের কোন বৃত্তিই মন্দ নহে, পরন্তু উহাদের প্রয়োগে বাড়াবাড়ি, শিথিলতা এবং অপব্যয়ের অনুপাতেই মন্দ হয়। স্বভাবজাত কোন বৃত্তির জন্য কেহ ভর্ৎসনার পাত্র হয় না, বরং উহার অপব্যবহার জন্য ভর্ৎসনার যোগ্য হয়। ফলতঃ, স্রষ্টা কর্তৃক স্বভাবজাত গুণের বণ্টন সকল জাতির জন্য সমান। যেরূপ তিনি বাহ্যিক নাক, চোখ মুখ, হাত,পা ইত্যাদি সকল জাতির মানুষকে দিয়াছেন, ঠিক সেইরূপে আভ্যন্তরিক বৃত্তি-নিচয়ও তিনি সকলকে দিয়াছেন। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই মধ্যম, বা উগ্র, বা নরমপন্থি, ভাল ও মন্দ মানুষ পাওয়া যায়। ধর্মের প্রভাবে কোন জাতির ভাল হওয়া বা ধর্ম কোন জাতির সভ্যতার কারণ হওয়া তখনই প্রমাণিত হইবে, যখন সেই ধর্মের পূর্ণ অনুগামী-*দের মধ্যে কোন কোন এমন আধ্যাত্মিক গুণ* সম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাঁহার তুলনা অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। সুতরাং, আমি জোরের সহিত দাবী করিতেছি যে, এই বৈশিষ্ট্য ইস্‌লামের আছে। ইহা হাজার হাজার ব্যক্তিকে পবিত্র জীবনের এরূপ উর্ধ মার্গে উন্নীত করিয়াছে যে, তাঁহাদের সম্পর্কে বলা হয় খোদা তা'লা যেন তাঁহাদের মধ্যে অধিষ্টান করিয়া আছেন। কবুলিয়তের জ্যোতিঃ তাঁহাদের মধ্যে এমন উজ্জ্বল হইয়াছে, যেন তাঁহারা খোদা-তা'লার বিকাশস্থল। এই জাতীয় মহামানব প্রত্যেক শতাব্দীতেই আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবন প্রমাণহীন নহে, বা মৌখিক দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু স্বয়ং খোদা-তা'লা সাক্ষ্য দেন যে তাঁহাদের জীবন পবিত্র।

স্মরণ থাকে যে, কোরআন শরীফে অতি উত্তম পর্যায়ের পবিত্র জীবনের লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জাতীয় মানুষের দ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশিত হয় এবং খোদা-তা'লা তাঁহাদের দোওয়া কবুল করেন ও তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করেন। যথাসময়ের পূর্বে ভবিষ্যৎ সমন্ধে তাঁহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন। অতএব, আমরা দেখিতেছি, ইসলাম ধর্মে হাজার হাজার মানুষ এইভাবে আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন। তদনুযায়ী বর্তমান যুগে এই অধম উক্ত নমুনা দেখাইতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই জাতীর মানব কোথায় *এবং কোন দেশে বাস করেন, যাঁহারা ইঞ্জিলের* বর্ণিত লক্ষণ অনুযায়ী তাঁহাদের প্রকৃত ইমান এবং পবিত্র জীবনের প্রমাণ দিতে পারেন? প্রত্যেক বস্তুই উহার নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত হয়। যথা, বৃক্ষ ফল দ্বারা পরিচিত হয়। যদি পবিত্র জীবনের শুধু দাবীই থাকে এবং ধর্ম-গ্রন্থে বর্ণিত নিদর্শন সেই দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে সেই দাবী অচল।

ইঞ্জিলে কি প্রকৃত ও সত্যিকার ইমানের কোন নিদর্শন লিখে নাই? ঐ নিদর্শনাবলী কি উহাতে অসাধারণ ধরণে বর্ণিত হয় নাই? যদি ইঞ্জিলে সত্যিকার ইমানের নিদর্শন বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদনুযায়ী প্রত্যেক ইমানের দাবীদার খ্রীষ্টানের ইমান, ইঞ্জিলে বর্ণিত লক্ষণ দ্বারা যাচাই করা উচিত। এক জন বড় সম্মানিত পাদ্রী এবং এক জন দরিদ্র হইতে দরিদ্র মুসলমানের সহিত আধ্যাত্মিক আলো এবং কবুলিয়তের মোকাবেলা করিয়া দেখা যাউক, ইহাতে যদি দরিদ্র মুসলমানের মোকাবেলায় সেই পাদ্রীর মধ্যে কোন স্বর্গীয় আলো কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি যাবতীয় শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। এই জন্য আমি এ সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের সহিত মোকাবেলার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছি। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি এবং আমার খোদাও সাক্ষী যে, প্রকৃত ইমান এবং সত্যিকারের পবিত্র জীবন যাহাতে ঐশী জ্যোতিঃ লাভ করা যায়, তাহা ইস্‌লাম ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে পাওয়া সম্ভবপর নহে। এই পবিত্র জীবন—যাহা আমি লাভ করিয়াছি—ইহা শুধু আমার মৌখিক ফাঁকা দাবী নহে। ইহাতে স্বর্গীয় সাক্ষ্য রহিয়াছে। কোন পবিত্র জীবন আসমানী সাক্ষ্য ব্যতিরেকে প্রমাণিত হইতে পারে না। কাহারও গোপন কপটতা এবং বেইমানী সম্পর্কে আমরা অবগত হইতে পারি না। যখন আসমানী সাক্ষ্য প্রাপ্ত পবিত্র অন্তঃকরণের মানব কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায়, তখন জাতির অবশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহাদিগকে পবিত্র দেখায় তাঁহাদিগকেও পবিত্র মনে করিতে হইবে। কারণ জাতির দৃষ্টান্ত এক দেশের ন্যায় এবং একই নমুনা দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে, উক্ত জাতি আসমানী পবিত্র জীবন পাইবার অধিকারী।*

ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই আমি খ্রীষ্টানদিগকে এক চূড়ান্ত ইশ্‌তেহার দিয়াছিলাম। যদি তাহারা সত্যান্বেষী হইত, তাহা হইলে তাহারা এই দিকে দৃষ্টি দিত। আমি এখনও বলিতেছি যে, খ্রীষ্টানদেরও ইমান এবং পবিত্র জীবনের দাবী আছে। এখন বিচার্য বিষয় এই যে, এতদুভয়ের মধ্যে খোদা-তা'লার নিকট কাহার ইমান গ্রহণীয় এবং কাহার জীবন সত্যই পবিত্র এবং কাহার ইমান কেবলমাত্র শয়তানী চিন্তা-ধারায় পরিপূর্ণ এবং পবিত্র জীবনের দাবী কেবল চক্ষুহীনের ধোকা মাত্র। সুতরাং, আমার নিকট সেই ইমান খাঁটি এবং গ্রহণীয়, যে ইমানের সঙ্গে আসমানী সাক্ষ্য ও কবুলিয়তের নিদর্শন রহিয়াছে। এইভাবে প্রকৃত পবিত্র জীবন উহাই, যাহার সহিত আসমানী সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যেকেই এই দাবী করে যে, তাহাদের মধ্যে পবিত্র জীবনধারী বহু মহামানব অতীত হইয়াছেন এবং বিদ্যমান আছেন। অধিকন্তু তাহাদের কার্যাবলী এবং আমলও পেশ করিয়া থাকে, যাহার আভ্যন্তরিক মীমাংসা করা কঠিন। অতএব, খ্রীষ্টানদের যদি

*নোট ঃ—এস্থানে পুরাতন কাহিনী পেশকরা অনর্থক। বর্তমানে ঘটনাবলি ইহার মোকাবেলায় দেখান উচিত। গ্রন্থকার

এই ধারণা থাকে যে, প্রায়শ্চিত্তবাদ দ্বারা পবিত্র ইমান এবং পবিত্র জীবন লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাদের কর্তব্য যেন প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া দোয়ার কবুলিয়ত এবং নিদর্শন প্রকাশের ব্যাপারে আমার মোকাবেলা করিয়া দেখিয়া লয়। যদি আসমানী নিদর্শন দ্বারা তাহাদের জীবন প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমি যে কোন শাস্তি গ্রহণে এবং সর্ব-প্রকার অপমান বরণ করিতে প্রস্তুত। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত কহিতেছি যে, আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠিতে খ্রীষ্টানদের জীবন একেবারেই অপবিত্র। সেই পবিত্র খোদা—যিনি আসমান ও জমিনের খোদা—তিনি তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সেইরূপ ঘৃণা করেন, যেরূপ আমরা পুতিগন্ধময় গলিত লাশকে ঘৃণা করি। আমি যদি এ বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া থাকি এবং এই কথায় আমার সঙ্গে খোদা না থাকেন, তাহা হইলে ধীর ও সুস্থিরভাবে আমার সহিত মীমাংসা করিয়া ফেলুন। আমি আবার বলিতেছি যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে সেই পবিত্র জীবন নাই, যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অন্তরকে আলোকিত করে। পরন্তু যে ভাবে আমি বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি, স্বাভাবিকভাবে কাহারও ভাল হওয়া যেরূপ সাধারণতঃ, অন্যান্য জাতিগণের মধ্যে পাওয়া যায়, এখানে সেই স্বভাবিক শিষ্টাচার সম্পর্কে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই ধরণের জন্মগত পবিত্র ও নম্র স্বভাবের লোক অল্প-বিস্তর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই পাওয়া যায়। এমন কি মুচি, মেথরও ইহার বাহিরে নয়। কিন্তু আমার কথা হইল, স্বর্গীয় পবিত্র জীবন সম্পর্কে, যাহা খোদা-তা'লার কালামের সাহায্যে লাভ করা যায় স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং স্বর্গীয় নিদর্শন সঙ্গে থাকে। কিন্তু এই জাতীয় জীবন খ্রীষ্টানগণের মধ্যে নাই। কে এখন আমাকে বুঝাইবে, 'অভিশপ্ত কোরবানী' কি উপকারে আসিল? খ্রীষ্টানগণ যীশুর প্রতি যে পরিত্রাণ পন্থার বিষয় অরোপ করিয়া থাকে, উহার বিস্তারিত আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন মনে জাগে যে, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের শিক্ষা কি এই 'অভিশপ্ত কোরবানী' ও 'অভিশপ্ত ভালবাসা' মানব জাতির পবিত্রতা এবং মুক্তির জন্য পেশ করিতেছে? অথবা অন্য কোন পন্থা পেশ করিতেছে? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কোন ঘৃণ্য ও অপবিত্র পন্থা হইতে ইস্‌লামের অঞ্চল একেবারে পবিত্র। উহা কোন অভিশপ্ত কোরবানী পেশ করে না। পক্ষান্তরে, উহা আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, সত্যিকারের পবিত্রতা লাভের জন্য আমরা যেন আমাদের জীবনের পবিত্র কোরবানী পেশ করি, যাহা আন্তরিকতার বারি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে এবং সততা ও ধৈর্যের আগুন দ্বারা শোধন করা হইয়াছে। যথা,

بلى من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون -

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি স্বীয় অস্তিত্ব খোদার সামনে রাখিয়া দেয় এবং স্বীয় জীবন তাঁহার পথে উৎসর্গ করে এবং নেক কাজে উৎসাহী হয়, অনন্তর সে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের উৎস হইতে পুরস্কার পাইবে। তাহাদের উপর কোন ভয় আসিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার যাবতীয় শক্তি খোদার পথে নিয়োজিত করে এবং একমাত্র খোদা-তা'লার জন্যই তাহার যাবতীয় কথা ও কাজ, চলাফেরা, অবস্থান—এবং যে সমস্ত জীবনই আল্লাহ্‌কে সোপর্দ করে ও সৎ-কাজ করিতে উৎসাহী থাকে, খোদা নিজের নিকট হইতে তাহাকে বিনিময় দিবেন এবং ভয়ভীতি ও দুঃখ হইতে তাহাকে পরিত্রাণ দিবেন। মনে রাখিবেন, 'ইস্‌লাম' শব্দ, যাহা এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোরআন শরীফে ইহাকে অন্য কথায় 'এস্তেকামত' (ধৈর্য) নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যেমন উহা এই দোয়া শিখাইতেছে ঃ

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم -

অর্থাৎ, "আমাদিগকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত কর, তাহাদের পথে যাহারা তোমার নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছে এবং যাহাদের জন্য স্বর্গীয় পথ খোলা হইয়াছে।" মনে থাকে যেন, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য উহার স্থিরতা দেখিয়া নির্ধারণ করা হয় এবং মানব জীবনের লক্ষ্য ইহাই যে, তাহাকে খোদার প্রেমের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেহেতু মানুষকে আল্লাহ্-তা'লার আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেজন্য তাহার জন্য নির্ধারিত সরল গতিপথ খাঁটিভাবে আল্লাহ্-তা'লার জন্য হইয়া যাওয়া। যখন সে তাহার যাবতীয় শক্তির দ্বারা খোদা-তা'লার হইয়া যাইবে, তখন অবশ্য তাহার জন্য পুরস্কার অবতীর্ণ হইবে, যাহাকে অপর কথায় পবিত্র জীবন নামে অভিহিত করা যায়। যেমন, তোমরা দেখ যে, যখন সূর্যের দিকের জানালা খুলিয়া দেওয়া হয়, তখন সুনিশ্চিতভাবে সূর্যের আভা ভিতরে আসিয়া পড়ে, তেমনই যখন মানুষ খোদা-তা'লার দিকে একেবারে সোজা হইয়া যায় এবং তাহার ও খোদা-তা'লার মধ্যে কোন অন্তরাল না থাকে, তখনই এক জ্যোতির্ময় আলো তাহার উপর অবতীর্ণ হয় এবং তাহাকে আলোকিত করে ও তাহার অভ্যন্তরিক অপবিত্রতা ধৌত করিয়া দেয়। যখন সে এক নূতন মানুষ হইয়া যায় এবং তাহার মধ্যে পরিবর্তন আসে, তখন তাহার পবিত্র জীবন লাভ হইয়াছে বলা যায়। এই পবিত্র জীবন লাভের স্থান এই পৃথিবীই। এই দিকে সঙ্কেত করিয়াই আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন ঃ—

من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى -

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ থাকে এবং খোদাকে দেখিবার আলো পাই না, সে

পরকালেরও অন্ধই থাকিবে।”

মোট কথা, খোদা-তা'লাকে দেখিবার জন্য মানুষ এই জগত হইতেই শক্তি লইয়া যায়।

যাহারা ইহজগতে দেখিবার শক্তি অর্জন করে নাই, তাহাদের ইমান কেচ্ছা কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহারা চিরঅন্ধকারে থাকিবে। ফল কথা, পবিত্র জীবন ও প্রকৃত মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে খোদা-তা'লার হইয়া যাই এবং অকপট বিশ্বাস্তার সহিত তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকি। অধিকন্তু সৃষ্ট বস্তুকে খোদাতা'লার অপকর্ম হইতে যেন দূরে থাকি। যদিও নিহত হই, খণ্ড বিখণ্ড হই ও অগ্নিতে জ্বলিতে থাকি, তথাপি যেন আমরা আমাদের রক্ত দিয়া আল্লাহ্-তা'লার অস্তিত্বের উপর মোহর করিয়া দিই। এই জন্য আল্লাহ্-তা'লা আমাদের ধর্মের নাম 'ইস্‌লাম' রাখিয়াছেন। ইহা দ্বারা সঙ্কেত করা হইয়াছে যে, আমরা খোদা-তা'লার সমক্ষে মস্তক রাখিয়া দিয়াছি। প্রাকৃতিক বিধানও পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, কোরআন শরীফে, পবিত্রতা ও প্রকৃত মুক্তি লাভের যে পথ দেখান হইয়াছে, জড় জগতেও এই বিধান দৃষ্ট হয়। উত্তম খাদ্যের অভাবে এবং অখাদ্য খাওয়ার ফলে অনেক রোগ দেখা দেয়। প্রকৃতিতে ইহার প্রতিকার উপযুক্ত পথ্য সংগ্রহ করা এবং অপথ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া। দৃষ্টান্তস্থলে, বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিবে সঞ্জীবতা রক্ষার জন্য উহার মধ্যে দুইটি ক্রীয়া আছে। প্রথমতঃ, উহা মাটির মধ্যে নিজ শিকড় গাড়িতে থাকে, যেন উহা মাটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুকাইয়া না যায়। দ্বিতীয়তঃ, বৃক্ষ উহার শিকড়ের নলযোগে মাটির রস টানিতে থাকে এবং এইভাবে উহা বাড়িতে থাকে। এই বিধানই আল্লাহ্-তা'লা মানুষের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন, অর্থাৎ, মানুষ সেই অবস্থায় কৃতকার্য হইতে পারে, যখন প্রথমতঃ সে সততা ও দৃঢ়তার সহিত খোদা-তা'লার মধ্যে নিজ স্বত্তাকে মজবুতভাবে নিবদ্ধ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনার সাহায্যে নিজ শিকড়গুলিকে খোদা-তা'লার প্রেমে প্রোথিত করে এবং ইহার পর বাক্যতঃ ও কার্যতঃ তাওবার মাধ্যমে খোদার দিকে অবনত হইয়া বিনয় ও নম্রতার নলের সাহায্যে আপন রাব্বের রহমত বারি আকর্ষণ করে এবং উক্ত পানির দ্বারা পাপের শুষ্কতা ধৌত করিয়া ফেলে এবং দুর্বলতা দূর করে। 'এস্তেগ্‌ফার' বা ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা ইমানের মূল দৃঢ় হয়। কোরআন শরীফে উহা দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক হইল, নিজ হৃদয়কে খোদার প্রেমে মজবুত করিয়া পাপ সমূহের প্রকাশকে ঠেকান, যাহা বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং খোদার মধ্যে বিলীন হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া। ইহাই নৈকট্য-প্রাপ্তগণের 'এস্তেগ্‌ফার'। তাঁহারা এক নিমিষও খোদা-তা'লা হইতে পৃথক হওয়া নিজেদের ধ্বংস বলিয়া মনে করেন। এই জন্য তাঁহারা 'এস্তেগ্‌ফার' করেন, যেন খোদা-তা'লা

তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখেন। দ্বিতীয় প্রকার 'এস্তেগ্‌ফার' হইল, পাপ হইতে বাহির হইয়া খোদা-তা'লার দিকে ধাবিত হওয়া এবং বৃক্ষ যেমন মাটিতে লাগিয়া যায়, সেই ভাবে চেষ্টা করা। অন্তঃকরণ যেন খোদার প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পবিত্রভাবে বর্ধিত হইয়া পাপের শুষ্কতা এবং অধঃপতন হইতে রক্ষা পায়। এই দুই প্রকারের অবস্থার নাম 'এস্তেগ্‌ফার' রাখা হইয়াছে। 'এস্তেগ্‌ফার' 'গাফর' শব্দ হইতে উদ্ভূত। উহার অর্থ 'ঢাকিয়া দেওয়া' এবং 'গাড়িয়া দেওয়া'। এমতে এস্তেগফারের উদ্দেশ্য হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্-তা'লার প্রেমে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আল্লাহ্-তা'লা যেন তাহার পাপ ঢাকিয়া দেন এবং মানবতার মূল নগ্ন হইতে না দেন। পরেও ঐশী চাদরে আচ্ছাদিত করিয়া স্বীয় পবিত্রতা হইতে যেন অংশ দেন, অথবা কোন শিকড় পাপের দ্বারা নগ্ন হইলে উহা ঢাকিয়া দেন এবং নগ্নতার অনিষ্টতা হইতে রক্ষা করেন। যেহেতু আল্লাহ্-তা'লা কল্যাণের উৎস এবং তাঁহার জ্যোতিঃ যাবতীয় অন্ধকার দূর করিবার জন্য সব সময় প্রস্তুত, এই জন্য পবিত্র জীবন লাভের ইহাই প্রকৃত পন্থা যে, আমরা এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে ভীত হইয়া সেই পবিত্র উৎসের প্রতি উভয় হস্ত প্রসারিত করি, যেন সেই উৎস প্রবল বেগে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসে এবং সমস্ত অপবিত্রতাকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। খোদা-তা'লাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার পথে মৃত্যুকে বরণ করিয়া স্বীয় অস্তিত্বকে তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া অপেক্ষা আর কোন উত্তম 'কোরবানী' নাই। এই 'কোরবানীর' শিক্ষাই খোদা-তা'লা আমাদিগকে দিয়াছেন। যথা তিনি বলিতেছেন:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون -

অর্থাৎ, "তোমরা প্রকৃত পুণ্য কখনও অর্জন করিতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না যাবতীয় প্রিয় বস্তু খোদার পথে ব্যয় কর।"

ইহাই পথ, যাহা কোরআন আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে এবং আসমানী সাক্ষ্যও উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিতেছে এই পথই সোজা পথ। বিবেকও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব, যে বিষয় বহু সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত, উহার মোকাবেলা সেই বস্তু কখনও করিতে পারে না যাহার কোন সাক্ষী নাই। নাসারাতীয় যীশু কোরআনের শিক্ষানুযায়ীই অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তদনুসারে যে ব্যক্তি, এই পবিত্র শিক্ষাকে স্বীয় পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিবে, সেই ব্যক্তিই যীশুর ন্যায় হইয়া যাইবে। এই শিক্ষাই হাজার হাজার লোককে মশীহ্ তৈরী করিতে প্রস্তুত এবং লক্ষ লক্ষ লোককে মশীহ্ করিয়াছে।

আমরা খুবই বিনয় ও ভদ্রতার সহিত পাদ্রী সাহেবগণের খেদমতে প্রশ্ন করিতেছি

যে, এক নিরীহ দুর্বল মানুষকে খোদা মানিয়া তাঁহাদের কি আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে? যদি তাঁহারা উন্নতি প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত। নতুবা, হে হতভাগ্য সৃষ্ট বস্তুর উপাসকগণ! আইস, আমাদের অগ্রগতি দর্শন কর এবং মুসলমান হইয়া যাও। ইহা কি ন্যায় নীতির কথা নহে যে, যাহার স্বীয় পবিত্র জীবন। যাহার পবিত্র ঐশী জ্ঞান ও পবিত্র প্রেমের বিষয়ে স্বর্গীয় সাক্ষ্য আছে, সে-ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার মূলধন শুধু কেচ্ছা কাহিনী, সে হতভাগ্য মিথ্যাবাদী এবং ময়লা ভক্ষণকারী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

যদি তৌহীদের প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করাই ইস্‌লামের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেন ইস্‌লামের প্রারম্ভে ইহুদীদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' করা হইয়াছিল? তাহাদের এলহামী কেতাবগুলিতে তৌহীদ ছাড়া কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। আজ কাল কেন ইহুদী বা যাহারা তৌহীদ মানে, তাহাদের নাজাতের জন্য মুসলমান হওয়া জরুরী মনে করা হয়?

উত্তর

জানা আবশ্যক, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সময়ে ইহুদীগণ তৌরীতের শিক্ষা হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছিল। যদিও ইহা সত্য যে, তাহাদের ধর্ম-পুস্তকগুলিতে সৃষ্টিকর্তার তৌহীদ ছিল, কিন্তু তাহারা এই তৌহীদ দ্বারা উপকৃত হইতেছিল না। যে মূল মহান উদ্দেশ্য মানুষের সৃষ্টি এবং ঐশী গ্রন্থগুলি নাযিল করা হইয়াছিল, তাহারা তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। প্রকৃত তৌহিদ হইল, খোদার অস্তিত্ব স্বীকার ও তাঁহার একত্ব মানার পর সেই পূর্ণ সত্ত্বা ও পরম দয়াময় খোদার আজ্ঞানুবর্তিতা ও সন্তুষ্টি অর্জনে নিমগ্ন থাকা এবং তাঁহার প্রেমে বিলীন হওয়া। প্রকৃতপক্ষে, আমলের দিক দিয়া এই তৌহীদ তাহাদের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। খোদা-তা'লার মহিমা ও প্রতাপ তাহাদের চিত্ত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। তাহারা শুধু মৌখিকভাবে "খোদা" "খোদা" বলিত। তাহাদের মন শয়তানের পূজারী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহদের হৃদয় জড় উপাসনা, পার্থিব স্বার্থ, প্রবঞ্চনা ও চালবাজিতে সকল সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দরবেশ ও রাহেবদের, তথা মঠবাসী সংসারত্যাগীদের পূজা চলিতেছিল। ভীষণ লজ্জা জনক কাজ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। কপটতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ষড়যন্ত্র ও ধোকবাজি অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে, তৌহীদ শুধু মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লা" বলা এবং হৃদয়ে সহস্র সহস্র প্রতিমা জমা হওয়ার নাম নয়। বরং যে ব্যক্তি তাহার নিজ কাজ,

ফন্দি, ধোকাবাজি বা চেষ্টা চরিত্রকে খোদার খোদার ন্যায় প্রাধান্য দেয়, কিংবা কোন মানুষের উপর এমন ভরসা রাখে যাহা খোদার উপর রাখা কর্তব্য, কিংবা নিজ স্বত্বাকে সেইরূপ প্রাধান্য দেয় যেরূপ খোদাকে দেওয়া উচিত, সে খোদা-তা'লার নিকট পৌত্তলিক। প্রতিমা শুধু তাহাই নহে—যাহা স্বর্ণ, রোপ্য, পিতল বা প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা নির্মাণ করা হয় এবং যাহার উপর ভরসা করা হয়;—বরং প্রত্যেক জিনিষ বা কথা বা কার্য যাহাকে এমন গুরুত্ব দেওয়া হয়—যাহা খোদা-তা'লার হক, উহা খোদা-তা'লার দৃষ্টিতে প্রতিমা। অবশ্য একথা সত্য, তৌরীতে সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতার ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু কোরআন শরীফ ইহার বিস্তৃত আলোচনায় ভরা। সুতরাং, কোরআন শরীফ নাযিল করার 'খোদা-তা'লার ইহাও একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, পৌত্তলিকতা—যাহা রোগের ন্যায় আক্রমণ চালাইতেছিল, উহাকে মানব চিত্ত হইতে দূর করা। সেই যুগে উক্তভাবে ইহুদীগণ পৌত্তলিকতা-মগ্ন হইয়াছিল এবং তৌরীত তাহাদিগকে বিরত করিতে পারিতেছিল না। কারণ তৌরীতে এই সূক্ষ্ম শিক্ষা ছিল না। এই ব্যাধি সব ইহুদীর মধ্যে প্রসার লাভ করায় তৌহীদের পবিত্র আদর্শ প্রকাশার্থে এক জীবন্ত সিদ্ধ পুরুষের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত তৌহীদ, যাহার স্বীকৃতি খোদা আমাদের নিকট চান, এবং যে স্বীকৃতির সহিত নাজাত সম্বন্ধ, তাহা এই যে খোদা-তা'লা তাঁহার সত্ত্বায়, মূর্তি, মানুষ, সূর্য, চন্দ্র, নিজাত্মা, প্রবৃত্তি, কিংবা আপন চেষ্টা চরিত্র ফন্দিফিকির ইত্যাদি সকল প্রকার রস্তুর অংশীবাদিতা হইতে পবিত্র জ্ঞান করা এবং তাঁহার প্রতিবিন্দীরূপে কোন শক্তিকে না মানা, কাহাকেও আহার্যদাতা স্বীকার না করা, কাহাকেও সম্মান-দাতা বা লাঞ্ছনাকারী ধারণা না করা, কাহাকেও সাহায্যকারী নির্ধারণ না করা। দ্বিতীয় কথা এই যে, স্বীয় প্রেম এক মাত্র তাঁহাকেই নিবেদন করা, 'এবাদত' স্বতন্ত্রভাবে শুধু তাঁহারই জন্য নিদিষ্ট করা, ভক্তিভরে বিনয়াবনত একমাত্র তাঁহারই নিকটে হওয়া ও সকল আশা ভরসা একমাত্র তাঁহারই উপর স্থাপন করা এবং ভয় শুধু তাঁহাকেই করা। কোন তৌহীদ নিম্নলিখিত তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য ছাড়া কামেল হইতে পারে না। প্রথমতঃ, সত্ত্বা হিসাবে তৌহীদ। তাঁহার অস্তিত্বের সম্মুখে—যাহা কিছু আছে—সবই না থাকার ন্যায় জ্ঞান করা এবং সমস্তই নশ্বর ও অসার মনে করা।

দ্বিতীয়তঃ, গুণের দিক হইতে তৌহীদ। অর্থাৎ, সৃষ্টি, পালন ও ত্রাণ বাচক গুণ এবং ঐশী গুণ স্রষ্টার সত্ত্বা ছাড়া কাহারও মধ্যে আরোপ না করা এবং বাহ্যিকভাবে যাহারা কর্মকর্তা ও কল্যাণ সাধনকারী বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়,

তাহাদিগকে তাঁহারাই পরিচালনাধীন বলিয়া প্রত্যয় করা।

তৃতীয়তঃ, প্রেম, নিষ্ঠা ও নির্মলতার দিক দিয়া তৌহীদ। অর্থাৎ, উপাসনার উপচার প্রেমাদিতে অন্যকে খোদা-তা'লার শরীক না করা এবং তাঁহাতেই বিলীন হওয়া। উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ তৌহীদ—যাহার উপর নাজাত নির্ভর করে, ইহুদীরা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের কদাচার একথার স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছিল যে, খোদার উপর বিশ্বাসের দাবী তাহাদের ওষ্ঠাগ্রে ছিল, হৃদয়ে ছিল না। কোরআন শরীফে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া খোদা-তা'লা বলিয়াছেন যে তাহারা যদি তৌরীত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা পালন করিত, তাহা হইলে স্বর্গীয় উপজীবিকাও তাহারা লাভ করিত এবং পার্থিব জীবিকাও পাইত। ইমানদারের নিদর্শনাবলী, যথা—অলৌকিক ঘটনা, দোয়া পূর্ণ হওয়া, দিব্যদর্শন এবং 'এল্‌হাম' তাহাদের মধ্যে পাওয়া যাইত। এ গুলি স্বর্গীয় উপজীবিকা। এই ছাড়া পার্থিব উপজীবিকাও তাহারা লাভ করিত। কিন্তু এখন তাহারা স্বর্গীয় উপজীবিকা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত এবং পার্থিব জীবিকাও সত্যাভিমুখী হইয়া নহে, সংসারাভিমুখী হইয়া লাভ করিতেছে। অতএব, উভয় জীবিকা হইতেই তাহারা বঞ্চিত।

এখন ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরআন শরীফের শিক্ষা দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদী ও নাসারার সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল যুদ্ধ মুসলমানগণের দিক হইতে কখনও আরম্ভ করা হয় নাই। এই যুদ্ধগুলি বল পূর্বক ধর্মে আনিবার জন্য করা হয় নাই। বরং ইস্‌লামের বিরুদ্ধবাদিগণ নিজেরা কষ্ট দিয়া বা শত্রুদের সাহায্য করিয়া এই সকল যুদ্ধের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছিল। যখন তাহাদেরই দিক হইতে যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি করা হইল, তখন ঐশী প্রতিহিংসা এই জাতিগুলিকে শাস্তি দিতে চাহিল এবং এই শাস্তির মধ্যেও আল্লাহ্‌-তা'লা আপন করুণায় এই সুযোগ রাখিলেন যে, ইস্‌লামে যাহারা প্রবেশ করিবে বা 'জিযিয়া' দিবে, তাহাদিগকে এই 'আযাব' হইতে রক্ষা করা হইবে।

এই সুযোগও খোদার প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী ছিল। কারণ প্রত্যেক বিপদ যাহা 'আযাবরূপে' অবতীর্ণ হয়, যেমন মহামারি বা দুর্ভিক্ষ, তাহাতে মানুষের বিবেক আপনা আপনিই দোয়া, তাওবা, উদ্বেগ ও সাদকা খয়রাত দ্বারা ঐ 'আযাবকে' টলাইবার দিকে ঝুকিয়া পড়ে। সর্বদা এইরূপই হইয়াছে। ইহা হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরম করুণাময় খোদা 'আযাব' দূর করিবার জন্য নিজেই লোকের মনে 'এল্‌হাম' করেন। হযরত মুসা আলাইহেস সালামের এর দোয়া কত বার গৃহীত হইয়া বনি ইস্রায়ীলের উপর হইতে 'আযাব' টলাইয়াছিল। বস্তুতঃ, ইস্‌লামের যুদ্ধ-

গুলি কঠিন প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদিগণের জন্য 'আযাব' ছিল। এই 'আযাবের' মধ্যে এক কৃপার দিকও উন্মুক্ত ছিল। অতএব, ইহা মনে করা ভুল যে, ইস্‌লাম তৌহীদ প্রচারের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে, যুদ্ধের বুনিয়াদ শুধু শাস্তি দানরূপে তখন স্থাপিত হইয়াছিল, যখন অন্য জাতিরা অত্যাচার ও দুঃখ দানে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

এখন এই প্রশ্ন থাকিল যে, ইহুদীগণের মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? তাহারা তো পূর্ব হইতেই একেশ্বরবাদী ছিল।

ইহার উত্তর আমরা এইমাত্র দিয়া আসিয়াছি। তৌহীদ ইহুদীদের হৃদয়ে কায়েম ছিল না। শুধু কেতাবে ছিল এবং তাহাও অপূর্ণভাবে। অতএব, তৌহীদের জীবিত 'রূহ' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের হৃদয়ে তৌহীদের প্রাণ-বস্তু সুদৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নাজাত লাভ হইতে পারে না। ইহুদীগণ মৃতের ন্যায় হইয়াছিল এবং হৃদয় পাষাণ হইয়া পড়ায় ও নানা প্রকার অবাধ্যতার ফলে, তাহাদের মধ্যে হইতে সেই জীবিত 'রূহ' বাহির হইয়া গিয়াছিল। খোদার প্রতি তাহাদের কোনই আকর্ষণ ছিল না এবং তাহাদের তৌরীতের শিক্ষার অপূর্ণতার জন্য নষ্ট এবং উহাতে শাব্দিক ও অর্থগত হস্তক্ষেপের ফলে তাহা পূর্ণ

নের যোগ্য ছিল না। এজন্য খোদা নির্মল বারি ধারার ন্যায় জিন্দা কালাম অবতীর্ণ করিলেন এবং এই জিন্দা কালামের দিকে তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, যেন তাহারা নানা প্রকার ধোকা ও ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রকৃত নাজাত লাভ করিতে পারে। সুতরাং, কোরআন শরীফ অবতরণের যে সকল প্রয়োজন ছিল, তন্মধ্যে মুর্দা প্রকৃতির ইহুদীদিগকে জিন্দা তৌহীদ শিখানও একটি। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের ভ্রান্তিগুলি সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করা। তৃতীয়তঃ, তৌরীতে যে সকল বিষয় শুধু সংকেতে বর্ণিত হইয়াছিল, যথা পুনরুত্থান, আত্মার স্থায়িত্ব, বেহেশত ও দোযখ, ইহাদের বিস্তৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা।

এ কথা সত্য যে, সত্যের বীজ বপন তৌরীত কর্তৃক সম্পন্ন হয়। ইঞ্জিল দ্বারা এই বীজ ভবিষ্যতের এক সংবাদ-দাতার ন্যায় মুখব্যাদন করিয়াছে এবং কোন ক্ষেত্রের সবুজ গাছগুলি যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নিয়া বাহির হয় এবং অবস্থা দ্বারা ঘোষণা করে যে, অতঃপর উত্তম ফল ও ছড়া দেখা দিবে, তেমনি ইঞ্জিল পূর্ণ পথ প্রদর্শকের জন্য সুসংবাদরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। ফুরকান দ্বারা সেই বীজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে ইহা পূর্ণ কল্যাণ আনিল। উহা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্তভাবে প্রভেদ করিয়া দেখাইল এবং ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীকে চরমে পৌছাইল, যেমন তৌরীতে পূর্ব হইতে লিখিত ছিল:

"সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন;

পারণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন।"[১]

ইহা অকাট্য সত্য যে, শরীয়তের প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ণরূপে শুধু কোরআন শরীফই প্রদর্শন করিয়াছে। দুইটি বড় ভাগে শরীয়ত বিভক্ত। (১) আল্লাহ্‌র হক। (২) বান্দার হক। এই উভয় অংশকে কেবল মাত্র কোরআন শরীফই পুরা করিয়াছে। কোরআনের এই সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, পশুগুলিকে মানুষ করা, মানুষকে নৈতিক মানুষ করা এবং নৈতিক মানুষকে খোদাভক্ত মানুষে পরিণত করা। বস্তুতঃ, এই মহাদায়িত্বকে ইহা যে ভাবে পূর্ণ করিয়াছে, উহার তুলনায় তৌরীত মূকবৎ।

কোরআনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ইহাও একটি বিষয় ছিল যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যে সব মতদ্বন্দ ছিল তাহা দূরীভূত করা। কোরআন শরীফ এই সমুদয় ঝগড়ার মীমাংসা করিয়াছে, যেমন কোরআন শরীফের يا عيسى اني متوفيك و رافعك الى الخ আয়েতটি[২] এই মীমাংসার্থেই অবতীর্ণ হইয়াছে। কারণ ইহুদীরা মনে করিত, যে খ্রীষ্টানদের নবী ক্রুশে লম্বিত হইয়াছিলেন। তৌরীতের নির্দেশ অনুসারে তিনি অভিশপ্ত (লানতী) হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উর্ধ্বগতি হয় নাই। ইহা তাঁহার মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ। খ্রীষ্টানেরা মনে করিত যে, তিনি অভিশপ্ত হইয়াছিলেন ঠিক, কিন্তু তাহাদের জন্য। পরে তাঁহার অভিশাপ অপসারিত হয়। তিনি উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হন ও খোদা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইয়া নেন। অতএব, এই আয়েত এই মীমাংসা দিয়াছে যে, অবিলম্বে তাঁহার উর্ধ্বগতি হইয়াছিল। ইহা সত্য নয় যে, ইহুদীদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী তিনি চির অভিশপ্ত হইয়াছিলেন যাহা চিরতরে আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্ব-গমনের বিরোধী। পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে কয়েক দিন অভিশপ্ত থাকিয়া পরে আল্লাহ্‌র দিকে তাঁহার উর্ধ-গমনের কথাও ঠিক নহে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্‌র দিকে তাঁহার উর্ধ-গমন হইয়াছিল। এই আয়েতগুলিতে খোদা-তা'লা ইহাও বুঝাইয়াছেন যে, এই উর্ধ-গমন তৌরীতের নির্দেশাবলীর বিরোধী নয়। কারণ উর্ধ্ব-গতি না হওয়া ও 'লানৎ' (অভিশাপ) তৌরীতের নির্দেশানুসারে শুধু তখন হয়, যখন কেহ ক্রুশে প্রাণত্যাগ করে। ক্রুশ শুধু স্পর্শ করায় বা ক্রুশে মৃত্যুসম কষ্ট ভোগ করিলে, কেহ অভিশপ্ত হয় না এবং ইহাতে উর্ধ্বগতি আটকায় না। কারণ তৌরীতের উদ্দেশ্য হইল, ক্রুশ খোদা-তা'লার দিক হইতে অপরাধীদের মৃত্যুর উপায়। এজন্য যে ক্রুশে প্রাণত্যাগ করে, তাহার অপরাধীর মৃত্যু হয়। ইহা অভিশপ্ত (লানতী) মৃত্যু। কিন্তু খ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণ-

---

(১) 'দ্বিতীয় বিবরণ,' ৩৩ ঃ ২ —সঃ 'আহ্‌মদী'।

(২) "হে ঈসা, আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব এবং তোমাকে আমার দিকে উত্তোলন করিব।" ['সুরাহ্ আলে ইমরান' ৫ রুকু] —সঃ 'আহ্‌মদী'

ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে খোদা ক্রুশের মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বরং তিনি যেমন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবস্থা যোনার ন্যায় হইবে, তেমনি হইয়াছিল।[১] যোনা মৎসের উদরে প্রাণত্যাগ করেন নাই। যীশুও ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই। তাঁহার প্রার্থনা, "এলী, এলী লেমা শবক্তানী"[২] মঞ্জুর হইয়াছিল। তাঁহার ক্রুশে মৃত্যু হইলে, পীলাতের উপরও নিশ্চয়ই দৈব শাস্তি উপস্থিত হইত। কারণ স্বর্গীয় দূত পীলাতের স্ত্রীকে এই সংবাদ দিয়াছিলেন: "যীশুর মৃত্যু ঘটিলে স্মরণ রাখিবে, তোমাদের বিপদ ঘটিবে।" কিন্তু পীলাতের উপর কোন বিপদ আসে নাই। যীশু জীবিত থাকার ইহাও একটি লক্ষণ যে, ক্রুশে তাঁহার হাড় ভাঙ্গা হয় নাই এবং ক্রুশ হইতে নামাইবার পর বিদ্ধ করায় তাঁহার রক্তপাত হইয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে ক্রুশের পর তাঁহার জখমও দেখাইয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, পুনর্জীবনের সঙ্গে ক্ষত থাকা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যীশু ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই। এ জন্য অভিশপ্তও হন নাই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহার পবিত্র মৃত্যু হইয়াছিল এবং খোদার সব রসুলগণের ন্যায় তিনিও খোদার দিকে উত্তোলিত হন এবং ঐশী প্রতিশ্রুতি "ইন্নি মুতাওয়াফ্ফিকা ও রাফেউকা ইলাইয়া"

[অর্থাৎ, আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব ও আমার দিকে উঠাইব' —সঃ আঃ]

অনুযায়ী খোদার দিকে তাঁহার ঊর্ধ্ব-গতি হইয়াছিল। তিনি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিলে, তাঁহার নিজ কথা দ্বারাই তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইতেন। কারণ ঐ অবস্থায় যোনা ভাববাদীর সহিত তাঁহার কোনই সামঞ্জস্য থাকিত না।

খ্রীষ্ট সম্বন্ধে এই বিবাদ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। কোরআন শরীফ ইহার মীমাংসা করিয়াছে। তবু এখন পর্যন্ত খ্রীষ্টানেরা বলে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? হে মূঢ় ও চিন্তান্ধ! কোরআন কামেল তৌহীদ আনিয়াছে। কোরআন যুক্তি ও শাস্ত্রীয় লেখাকে একাত্রিত করিয়া দেখাইয়াছে। কোরআন তৌহীদকে চরমে পৌছাইয়াছে। কোরআন তৌহীদ ও স্রষ্টার গুণাবলীর যুক্তি দিয়াছে এবং খোদাতা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ যুক্তি ও শাস্ত্র বাক্য

---

(১) অর্থাৎ, ইয়ুনুস নবী। 'মথি': ১২: ৩৯—৪০ পদে লিখিত আছে:

"এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবা রাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।" —সঃ আহ্‌মদী

(২) অর্থাৎ, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" ['মথি', ২৭: ৪৬]

—সঃ 'আহ্‌মদী'

দ্বারা দিয়াছে। 'কাশফ' ('দিব্যদর্শন') দ্বারাও যুক্তি দিয়াছে, ইতিপূর্বে ধর্ম কেচ্ছা কাহিনীর আকারে প্রচলিত ছিল। কোরআন ইহাকে বিজ্ঞানে রূপায়িত করিয়া দেখিয়াছে। ধর্মের প্রত্যেকটি বিশ্বাসকে জ্ঞানের পোষাক পরাইয়াছে। ধর্মের অপূর্ণ সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীকে পূর্ণতা দিয়াছে। যীশুর স্কন্ধ হইতে 'অভিশাপের' মালা অপসারিত করিয়াছে এবং তাঁহার ঊর্ধ্ব-গতি ও সত্য নবী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়াছে। এত সব কল্যাণ বিতরণ সত্ত্বেও কি কোরআন শরীফের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইল না?

স্মরণ রাখিতে হইবে, কোরআন শরীফ স্বীয় প্রয়োজনীয়তার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ দিয়াছে। কোরআন শরীফে পরিষ্কার বলা হইয়াছে:

اعلموا ان الله يحيى الارض بعد موتها

অর্থাৎ, "একথা জানিয়া রাখ যে, পৃথিবী মরিয়া গিয়াছিল। এখন খোদা নূতনভাবে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন।" ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে সব জাতিরই রীতি নীতি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। 'মিযানুল্-হক' প্রণেতা পাদ্রী ফণ্ডেল,—যাঁহার শিরায় শিরায় বিদ্বেষ ভরা—তিনিও স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়াছেন, "কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইহুদী ও খ্রীষ্টান অনাচারী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইতেছিল। কোরআনের আগমন তাহাদের জন্য একটি সতর্কবাণী ছিল।" কিন্তু এই নির্বোধ যদিও স্বীকার করিল যে, কোরআন ঐ সময়ে আসিয়াছিল যখন ইহুদী ও খৃষ্টানদের রীতি নীতি যারপরনাই খারাপ হইয়া পড়িতেছিল, তবু এই মিথ্যা ওজর উপস্থিত করিল যে, এক মিথ্যা নবী পাঠাইয়া ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে সতর্ক করা আল্লাহ্-তা'লার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু ইহা আল্লাহ্-তা'লার উপর অপবাদ। আমরা কি মহা-মহিমান্বিত আল্লাহ্-জাল্লা শানুহুর প্রতি এইরূপ কদাচার আরোপ করিতে পারি যে, তিনি মানুষকে পথ-ভ্রষ্ট ও অনাচারী দেখিয়া তাহাদিগের জন্য আরো বিপথগামী হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করিলেন ও কোটি কোটি খোদা-ভক্তকে স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিলেন? কঠিন বিপদাপদের সময় কি খোদা-তা'লার প্রাকৃতিক বিধানে তাঁহার এই রীতিই প্রমাণিত হয়? দুঃখের বিষয়, ইহারা পার্থিব প্রেমের মোহে কিরূপে প্রভাকরের দিকে থুথু নিক্ষেপ করিতেছে। এক জন সামান্য মানুষকে খোদাও বলে, আবার অভিশপ্তও বলে এবং সেই মহানবীকে অস্বীকার করে, যিনি এমন সময় আসিয়াছিলেন যখন মানব জাতি মৃতবৎ হইয়া পড়িতেছিল। তাহারা আরো বলে যে, কোরআনের প্রয়োজন কি ছিল? হে গাফীল ও অন্ধগণ, কোরআন যেমন অধার্মিকতার তুফানের যুগে আসিয়াছিল, কোন নবী তেমন যুগে আসেন নাই। ইহা পৃথিবীকে অন্ধ পাইয়া আলোক দান করিয়াছিল, পথ-ভ্রষ্ট পাইয়া পথ-প্রদর্শন করিয়া

ছিল এবং মৃত পাইয়া প্রাণ দান করিয়াছিল। তবু কি ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণে কিছু বাকি রহিয়াছে? যদি বল, "তৌহীদ পূর্বেও ছিল, কোরআন নূতন কি জিনিষ দিয়াছে?" তবে ইহাতে আরও তোমাদের বুদ্ধির প্রতি কান্না আসে। আমি ইতিপূর্বে লিখিয়াছি যে, তৌহীদ পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থগুলিতে অসম্পূর্ণাকারে বিদ্যমান ছিল। তোমরা কখনও প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, পূর্ণ আকারে ছিল। এতদ্ব্যতীত, তৌহীদ মানুষের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিল। কোরআন এই তৌহীদকে আবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং ইহাকে চরমে পৌঁছাইয়াছে। কোরআন শরীফের নাম এই জন্য 'যিকর্'—অর্থাৎ 'স্মারক' একটু চক্ষু মেলিয়া চিন্তা কর, তৌরাত তৌহীদ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিল তাহা এমন কি নূতন কথা ছিল যে, পূর্ববর্তী নবীগণ তাহা জানিতেন না। ইহা কি সত্য নয় যে, সর্ব প্রথমে আদম, তার পর শীস, নোহ[১], আব্রাহাম[২] ও অন্যান্য রসুলগণ যাঁহারা মোশির[৩] পূর্বে আগমন করেন, তৌহীদের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? সুতরাং, তৌরীতের বিরুদ্ধেও তো এই আপত্তি উঠে যে, উহা নূতন কি জিনিস উপস্থিত করিয়াছিল? হে কুটিলচিত্ত জাতি! খোদা প্রত্যহ নূতন হইতে পারেন না। মোশির সময়েও সেই খোদা-ই ছিলেন, যিনি আদম, সীস, নোহ, আব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব[১] ও যোষেফের[২] সময় ছিলেন এবং তৌরীত সেই তৌহিদই বর্ণনা করিয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী নবীগণ বর্ণনা করিয়া আসিতেছিলেন।

এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, তৌরীত, কেন সেই পুরাতন তৌহীদ নিয়াই আলোচনা করিয়াছে, তবে ইহার উত্তর এই যে, খোদার অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয় তৌরীত হইতে আরম্ভ হয় নাই; বরং আদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য, কোন কোন যুগে ধর্ম-কর্ম ত্যাগের ফলে অধিকাংশ ব্যক্তির দৃষ্টি হইয়াগিয়াছিল ব্যক্তির দৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় হইয়াগিয়াছিল। অতএব, ঐশী গ্রন্থাবলী ও ভাববাদীগণের[৩] প্রয়োজন এই জন্য ছিল যে, তাঁহারা এমন সময়ে আসিতেন, যখন তৌহীদের প্রতি মানুষের মনোযোগ একেবারে অল্প হইয়া যাইত এবং নানা প্রকার শেরিকের মধ্যে

১ 'নোহ'—নূহ (আঃ) ২ 'অব্রাহাম'—ইব্রাহীম (আঃ); (৩) 'মোশি'—মুসা (আঃ) অনুবাদে খ্রীষ্টান ভ্রাতাদের সুবিধার্থে আমরা বাইবেলোক্ত হীব্রু উচ্চারণ দিয়াছি।

—সঃ 'আহমদী'

(১) 'যাকোব'—ইয়াকুব (আঃ); (২) 'যোযেফ'—ইউসুফ (আঃ)। অনুবাদে পূর্বোক্ত কারণে হীব্রু নাম গৃহীত হইয়াছে।

—সঃ 'আহ্মদী'।

(৩) 'ভাববাদী'—নবী। পূর্বোক্ত কারণে অনুবাদে ইহা গৃহীত হইয়াছে।

—সঃ 'আহ্মদী'

আপাতিত হইত। পৃথিবীতে এই বিষয়ের সহস্র সহস্র বার মিনা করা হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র বার ইহাতে মরিচা পড়িয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। তৌহীদ যখনই অদৃশ্য হইয়াছে, তখনই খোদা আবার তাঁহার কোন বান্দাকে পাঠাইয়াছেন, যাহাতে নূতনভাবে ইহাকে উজ্জ্বলাকারে প্রদর্শন করেন। পৃথিবীতে এইভাবে কখনও আঁধার কখনও আলোক পর্যায়-ক্রমে অধিকার বিস্তার করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক নবীর পরিচয়ার্থে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট কষ্টি। দেখিতে হইবে যে, তিনি কখন আসিয়াছেন এবং কতখানি সংস্কার তাঁহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। সত্যান্বেষীগনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া এ কথা চিন্তা করা উচিত। দুষ্ট ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদের অন্যায় হস্তক্ষেপ মূলক বাক্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিতে নাই। পরিষ্কার দৃষ্টি লইয়া কোন নবীর অবস্থা দেখুন, তিনি আবির্ভূত হইয়া সমসাময়িক জনগণকে কেমন অবস্থায় পাইয়া, তাহাদের বিশ্বাস ও রীতি-নীতিতে কি প্রকার পরিবর্তন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন? ইহা দ্বারা নিশ্চয় জানা যাইবে যে, কোন নবী সর্বাধিক প্রয়োজনের সময় আসিয়াছিলেন এবং কে তদপেক্ষা নিম্নতর প্রয়োজন কালে আগমন করেন। পাপীদের জন্য নবীর প্রয়োজন অবিকল তেমনি যেমন রোগীর জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন। রোগীদের সংখ্যাধিক্যে যেমন চিকিৎসকের প্রয়োজন, পাপীদের সংখ্যাধিক্যে তেমনি সংস্কারকের প্রয়োজন।

এখন যদি কেহ এই নিয়মকে মনে রাখিয়া আরবের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যে, আরবের অধিবাসিগণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে কিরূপ ছিল এবং পরে কিরূপ হইয়াছিল, তবে নিঃসন্দেহে শেষ যুগের এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পবিত্রীকরণ ক্ষমতা, মহাশক্তিশালী প্রভাব এবং বিস্তৃতিশীল কল্যাণকে, সকল নবীর তুলনায় শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং এই ভিত্তি-মূলেই সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও কোরআন শরীফের প্রয়োজনীয়তা অন্য সব গ্রন্থ ও নবীদের প্রয়োজনীয়তা হইতে দেদীপ্যমান বলিয়া প্রত্যয় করিবে। দৃষ্টান্ত স্থলে, যীশু পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীর কোন্ প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছিলেন? তিনি যে, কোন প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? ইহুদীদের চরিত্র, অভ্যাস ও ইমানে, কোন বড় রকমের পরিবর্তন আনিয়াছিলেন কি? অথবা তাঁহার শিষ্যদের আত্মিক পবিত্রতার পরম উৎকর্ষতা সাধন করিয়াছিলেন কি? এই সকল পবিত্র সংস্কার সাধন সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ নাই। যদি কোন প্রমাণ থাকিয়া থাকে, তবে ইহাই যে লোভ লালসায় ভরা কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সাথী হইয়াছিল। অবশেষে, তাহারা অত্যন্ত লজ্জা জনক বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয়। যীশু যদি আত্ম-হত্যা করিয়া থাকেন, তবে আমি ইহার অধিক স্বীকার করিব না যে এমন এক নির্বুদ্ধিতা সূচক কার্য তাঁহার দ্বারা

প্রকটিত হইয়াছিল যে, মানবতা ও যুক্তি তাহাতে কলঙ্কিত হইয়াছিল। যে কার্য, মানুষের তৈরী আইনেও সর্বদা অপরাধ বলিয়া গণ্য করে, কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি তাহা করিতে পারে? কখনও না। অতএব, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যীশু কি শিখাইয়াছিলেন এবং কি দিয়া-গিয়াছিলেন? সেই 'অভিশপ্ত কুরবানী'! —বুদ্ধি ও বিচারের নিকট যাহার কোনই ফল জানা নাই।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইঞ্জিলের শিক্ষায় নূতন কোন সৌন্দর্য নাই। বরং ইহার সব শিক্ষাই তৌরীতে পাওয়া যায় এবং এক বৃহৎ অংশ ইহুদীদের 'তালমুদ' কেতাবে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। ইহুদী পণ্ডিতেরা এখনও চীৎকার করেন যে, তাঁহাদের পুস্তকগুলি হইতে ঐ সকল কথা চুরি করা হইয়াছিল। ইদানিং এক ইহুদী পণ্ডিতের কেতাব আমি পাইয়াছি। তিনি একথা প্রমাণ করিবার জন্য কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন এবং অত্যন্ত জোর দিয়া সনদ উপস্থিত করিয়াছেন যে, কোথা কোথা হইতে ঐ সকল বাক্য চুরি করা হইয়াছে আমি এই কেতাব শুধু মিঞা সেরাজদ্দীনের জন্য আনাইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি তাহা দেখিবার পূর্বে চলিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেন যে, প্রকৃত পক্ষে ইঞ্জিল ইহুদী গ্রন্থের ঐ সকল বিষয়ের সারমর্ম যাহা খৃষ্ট পসন্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে বলেন যে খ্রীষ্টের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য কোন নূতন শিক্ষা দান ছিল না; বরং আপনাকে কুরবানী করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ, সেই অভিশপ্ত কুরবানী যাহার বার বার উল্লেখ হইতে আমি এই পুস্তিকাকে পবিত্র রাখিতে চাই। বস্তুতঃ, খ্রীষ্টানেরা এই ভ্রমে পড়িয়াছে যে, শরীয়ত (ব্যবস্থা) তৌরীত পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া যীশু কোন বিধান সহ আসেন নাই; বরং নাজাত দেওয়ার উপকরণ লইয়া আগমন করেন এবং কোরআন অযথা আবার এমন ব্যবস্থার বুনিয়াদ কায়েম করিয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে পূর্ণতা লাভ করিয়া-ছিল। এই ধোকা খ্রীষ্টানদের ইমান খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই কথা আদৌ সত্য নয়। আসল কথা হইল, মানুষ ভুল-প্রবণ। মানব জাতির মধ্যে খোদার আদেশাবলী পালনের দিক হইতে সর্বদা কায়েম থাকিতে পারে না। এ জন্য সর্বদা নূতন স্মরণ দাতা ও শক্তি-দাতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোরআন শরীফ শুধু এই দুই প্রয়োজনের কারণেই অবতীর্ণ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, ইহা পূর্ববর্তী শিক্ষা সমূহের পরিপূরক ও শেষ বাক্য; দৃষ্টান্ত স্থলে, তৌরীত যুগের অবস্থানুসারে জোর দেয় প্রতি-শোধ গ্রহণের উপর, এবং ইঞ্জিল উহার যুগের অবস্থানুসারে ক্ষমা, ধৈর্য ও স্বেচ্ছায় অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি না করার উপর। কোরআন উভয় অবস্থায়ই বিচারের পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষা দেয়। তৌরীত প্রত্যেক ব্যাপারে আতিশয্যের দিকে গিয়াছে এবং

ইঞ্জিল লঘুতার দিকে গিয়াছে। কোরআন শরীফ মধ্য-পন্থা শিক্ষা দেয়—ক্ষেত্র ও ঘটনা দেখিয়া বিচার করিতে বলে। তিন কেতাবেরই শিক্ষার বিষয় বস্তু এক হওয়া সত্ত্বেও একটি কেতাব এক বিষয়ের এক দিকে বিশেষ জোর দিয়াছে এবং অন্যটি অপর দিকে জোর দিয়াছে। কিন্তু কোরআন শরীফ মানুষের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মধ্য-পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। বিচার বিষয়ে ক্ষেত্র ও অবস্থার প্রতি নজর রাখাই জ্ঞানের কাজ। এ জন্য শুধু কোরআন শরীফই এই জ্ঞানের শিক্ষা দেয়। তৌরীত এক বৃথা কঠোরতার দিকে আকর্ষণ করে এবং ইঞ্জীল এক অমূলক ক্ষমার উপর জোর দেয়। কোরআন শরীফ সময় বিচারের তাগিত করে। সুতরাং* মাতৃ-স্তনে পৌছিয়া রক্ত যেমন দুগ্ধে পরিণত হয়, সেইরূপ তৌরীত ও ইঞ্জিলের আদেশগুলি কোরআন শরীফে আসিয়া জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। কোরআন শরীফ না আসিলে তৌরীতও অন্ধের তীর ছুড়ার ন্যায় হইত। কদাচিৎ এক আধটা লক্ষ্য স্থলে পৌছিত এবং শত শত বার ব্যর্থ হইত। বস্তুতঃ, শরীয়ত গল্পাকারে তৌরীত কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইঞ্জিলের রূপ প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানের ধারায় কোরআন হইতে সত্য আসিয়াছে এবং সত্যান্বিষীগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অতএব, তৌরীত ও ইঞ্জিলের তুলনা কোরআনের সহিত কি ভাবে হইতে পারে? এমন কি, কোরআন শরীফের কেবল প্রথম সুরাহ্‌র সহিত তুলনা করিতে চাহিলে,—অর্থাৎ সুরাহ্‌ ফাতেহা যাহার সাতটি মাত্র আয়াত এবং—যে উৎকৃষ্টতম সমন্বয়, দৃঢ় গঠন ও স্বাভাবিক শৃঙ্খলা সহ এই সুরাহ্‌তে শত শত সত্য, ধর্ম তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান রাশি সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা মোশির কেতাব বা যীশুর কয়েক পৃষ্ঠার ইঞ্জীল হইতে বাহির করিতে চাহিয়া আজীবন চেষ্টা করিলেও এই চেষ্টা ফলোদায়ক হইবে না। ইহা বৃথা বাগাড়ম্বর নহে। সত্য এবং প্রকৃত কথা ইহাই। তাত্ত্বিক জ্ঞান ভাণ্ডারে সুরাহ্‌ ফাতেহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সাধ্য তৌরীত ও ইঞ্জিলের নাই। আমরা কি করিতে পারি এবং মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে? পাদ্রী সাহেবগণ আমাদের কোন কথাই মানেন না। ভাল, যদি তাঁহারা তাঁহাদের তৌরীত ও ইঞ্জিলকে সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও সত্য সমূহের বর্ণনায় এবং ঐশী-বাণীর গুণাবলী প্রকাশ বিষয়ে কামেল বলিয়া মনে করেন, তবে আমরা পুরস্কার বাবদ নগদ ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা তাঁহাদিগকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। যদি তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র বিপুল আয়তন প্রায় ৭০ খানা পুস্তক হইতে (শরীয়তের) ঐ সকল তত্ত্ব ও সত্য, অন্বয় ও শৃঙ্খল-যুক্ত জ্ঞান রত্ন ও ঐশীবাণী বৈশিষ্ট দেখাইতে

* এই কঠোরতা ও নম্রতা যুগ ও জাতির অবস্থার দিক দিয়া উপযোগী শিক্ষা ছিল। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা ছিল না, যাহা ত্যাগ করিবার নয়। (গ্রন্থকার)

পারেন, যাহা সুরাহ্ ফাতেহা হইতে আমরা পেশ করিব এবং যদি এই টাকা অল্প হইয়া থাকে, তবে আমাদের পক্ষে যত বেশী সম্ভবপর হয়, আমরা তাঁহাদের আবেদন পাইয়া বৃদ্ধি করিব এবং আমরা পরিষ্কার মীমাংসার্থে প্রথমে সুরাহ্ ফাতেহার এক তফসীর তৈরী করিয়া ছাপিয়া উপস্থিত করিব। উহাতে সুরাহ্ ফাতেহায় নিহিত সব সত্য, তত্ত্ব ও ঐশী-বাণীর গুণ বর্ণনা করিব। পাদ্রী সাহেবদের কর্তব্য হইবে তৌরীত, ইঞ্জীল ও তাঁহাদের সমস্ত কেতাব-গুলি হইতে সুরাহ্ ফাতেহার মুকাবিলায় সত্য, সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ঐশী বাক্যের বিশেষত্ব অর্থাৎ অলৌকিক আশ্চর্য ঘটনাবলি যাহা মানুষের বাক্যে পাওয়া সম্ভবপর নয়—উপস্থিত করিয়া দেখান। যদি তাঁহারা এই প্রকার প্রতিযোগিতা করেন এবং ভিন্ন জাতীয় ন্যায়পরায়ণ তিন ব্যক্তি বলেন যে, সুরাহ্ ফাতেহায় যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব, ঐশী বাণীর গুণ ও বৈশিষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের দ্বারা উপস্থাপিত বিবরণেও প্রমাণিত হয়, তবে পাঁচ শত টাকা যাহা পূর্ব হইতে তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের মনোনীত স্থানে জমা রাখা হইবে, আমরা দিব।'

এখন কোন পাদ্রীর এই প্রকার প্রতি-যোগিতা করিবার সাহস আছে কি? খোদার কালাম খোদার শক্তি দ্বারা নির্নীত হয়, যেমন তাঁহার সৃষ্টি কৌশল প্রাকৃতিক বিস্ময়কর লীলা দ্বারা প্রমাণিত হয়। যথা—আকাশে সহস্র তারকা ও নক্ষত্র বিরাজমান। যদি কোন নির্বোধ কতকগুলি তারকার প্রতি সংকেত করিয়া বলে যে এগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া ইহারা খোদা-তা'লার তরফ হইতে নয় কিংবা কতিপয় বৃক্ষ, লতা, পাথর বা জন্তুর নাম নিয়া বলে যে, ইহাদের অস্তিত্ব বাদেও অন্য বৃক্ষ লতাদি দ্বারা কাজ চলিতে পারে, এজন্য এগুলি খোদা-তা'লার তরফ হইতে নয়; তবে তাহাকে পাগল বা বোকা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

একথা, স্মরণ রাখিবার উপযোগী যে কোর-আন মানুষের পূর্ণ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং ইহা যাবতীয় পূর্ণ গুণমালার আকর। কোরআনের সহিত তৌরীতের তুলনা এক পান্থশালার, যাহা অনেকগুলি ভীষণ বাত্যা ও ভূমিকম্পের ফলে ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং পান্থশালার পরিবর্তে একটি ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। পায়-খানার ইট পাকাশয়ে এবং পাকাশয়ের ইট পায়খানায় গিয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত গৃহখানি উলটপালট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর, পান্থ-শালার মালীকের, মুসাফেরদের অবস্থা দেখিয়া দয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহার পরিবর্তে এমন একটি উত্তম, ও আরামপ্রদ মুসাফির-খানা নির্মাণ করিলেন, যাহা পূর্বাপেক্ষা ভাল; মুসাফিরদের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক। কামরাগুলি প্রয়োজনানুযায়ী সজ্জিত। এবং কোন প্রয়োজনের জন্য গৃহের অভাব নাই। মালীক শেষোক্ত পান্থশালা নির্মাণে কিছু ইট পূর্ববর্তী পান্থশালা হইতে গ্রহণ করিলেন।

তদোতিরিক্ত আরো অনেক ইট ও কাঠ ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহ করিলেন, যাহাতে বাড়ীটি সর্বতো ভাবে যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ, কোরআন শরীফ এই শেষোক্ত পান্থনিবাস। যাহার চক্ষু আছে, দেখুক।

এখানে আরো একটি আপত্তির খণ্ডন প্রয়োজন। যেহেতু খাঁটি ও পূর্ণ শিক্ষার ইহাই পরিচয় যে, উহাতে স্থান ও কালের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় ও যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিষদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, অতএব কি কারণে তৌরীত ও ইঞ্জিলে ইহা নাই এবং কোরআন শরীফ এগুলিকে পূর্ণতা দিয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, তৌরীত ও ইঞ্জিলের দোষ নাই। দোষ জাতিদের যোগ্যতার। ইহুদী, যাহাদের সহিত হযরত মুসা (মোশির) (আঃ) এর পালা পড়িয়াছিল, তাহারা চারিশত বৎসর পর্যন্ত ফেরৌনের দাস্ত্ব পাশে আবদ্ধ ছিল এবং দীর্ঘ কাল ব্যাপী নিপীড়িত হইতে থাকিয়া ন্যায়পরায়নতা ও সুবিচারের প্রকৃত তত্ব হইতে বেখবর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়ম যে যুগের বাদশাহ, যিনি রাজ্যের মধ্যে আদর্শ গুরু স্থানীয় হইয়া থাকেন, তিনি সুবিচারক হইলে প্রজাদের মনেও ন্যায়পরায়ণতার আলোকপাত হয় এবং তাহারাও স্বভাবতঃ ন্যায়পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট হয়। সৌজন্য ও শিষ্টতা তাহাদের মধ্যে উদগত হইয়া ন্যায়পরায়ণতাসূচক গুণগুলি আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু বাদশাহ অত্যাচারী হইলে, প্রজাগণও তাঁহার নিকট অত্যাচার ও অবিচারের শিক্ষা গ্রহণ করে। তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ন্যায়পরায়ণতা বিবর্জিত হইয়া পড়ে। বনি-ইস্রায়েলগণেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাহারা দীর্ঘ সময় ব্যাপী ফেরৌণের ন্যায় অত্যাচারী বাদশাহের প্রজা থাকায় এবং নানা প্রকার নিপীড়ণ ভোগ করিবার ফলে ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য সর্ব প্রথম তাহাদিগকে ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেওয়া হযরত মুসার (মোশি) (আঃ)এর কর্তব্য ছিল। এ কারণ তৌরীতে ন্যায়পরায়ণতা রক্ষার্থে কঠোরতাপূর্ণ পদাবলী পাওয়া যায়। অবশ্য, দয়া সংক্রান্ত পদাবলীরও তৌরীতে সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে এই প্রকার পদাবলীও ন্যায়পরায়ণতার সীমা রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য এবং অবৈধ উত্তেজনা ও অন্যায় প্রতিহিংসাপরায়ণতা রোধ করিবার জন্য বর্ণিত হইয়াছে। সর্বত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার মূলক বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা কিন্তু ইঞ্জিল পাঠে এই উদ্দেশ্য জানা যায় না। ইঞ্জিলে ক্ষমা ও প্রতিশোধ ত্যাগের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। আমরা গভীর দৃষ্টি সহ ইঞ্জিলের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার বিবরণে পরিষ্কার দেখিতে পাই যে এই পুস্তক প্রণেতা, তাঁহার সম্মুখস্থ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন যে, তাহারা দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য ও প্রতিশোধ ত্যাগ হইতে সম্পূর্ণ দূরে ছিল এবং চাহিতেছিলেন, যেন

তাহাদের হৃদয় এমন হইয়া যায় যে প্রতিশোধ গ্রহনেচ্ছু না হইয়া ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও পরের অন্যায় উপেক্ষা করিবার মত অভ্যাস তাহাদের হয়। ইহার কারণ ইহাই যে হযরত ঈসা* আলাইহেস্ সালামের সময় ইহুদীগণের চারিত্রিক অবস্থার অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছিল। তাহারা বিবাদ বিসম্বাদ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল। ন্যায়পরায়ণতার বাহানায় তাহারা দয়া ও ক্ষমার স্বভাবকে অন্তর হইতে একেবারে বিদূরীত করিয়া দিয়াছিল। এজন্য ইঞ্জিলের বিধান যুগ বা জাতি বিশেষের জন্য ব্যবস্থারূপে তাহাদিগকে শোনান হইল। কিন্তু ইহা যুগোপযোগী ব্যবস্থার চিত্র ছিল। এজন্য কোরআন আসিয়া ইহাকে অপসারিত করিল।

কোরআন শরীফের প্রতি অভিনিবেশ সহ দৃষ্টিপাত করিলে এবং পরিষ্কার মন নিয়া ইহার উদ্দেশ্যের গভীরতার মধ্যে ডুব দিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই কোরআন তৌরীতের ন্যায় প্রতিশোধ ও কঠোরতার উপর জোর দেয় নাই, যেমন তৌরীতের যুদ্ধাবলী ও প্রতিশোধমূলক নিয়মাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং ইঞ্জিলের ন্যায় ক্ষমা, ধৈর্য ও দোষ না ধরার শিক্ষার প্রতি একেবারে ঝুকিয়া পড়ে নাই। বরং বারবার ভাল বিষয়ের আদেশ দেয় এবং অন্যায়ের নিষেধ করে। অর্থাৎ, এই আদেশ দেয় যে বুদ্ধি ও বিধানের দিক দিয়া যাহা ভাল ও উপযোগী, তাহা পালন করিবে। বুদ্ধি ও বিধানের দিক হইতে যে বিষয়ে আপত্তি উঠে, যাহা নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের অন্তর্গত, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। অতএব কোরআন শরীফে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে ইহার আইন কানুন, বিধিনিষেধ ও আদেশগুলিকে যুক্তির দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। ব্যক্তিগত বিধিনিষেধের কারাগারে উহা আমাদিগকে বন্দি করিতে চাহে না। পরন্তু নিজ পবিত্র শরীয়তকে সার্বভৌমিক মৌলিক নীতি রূপে বর্ণনা করে। দৃষ্টান্তস্থলে, উহার একটি মৌলিক আদেশ এই যে, মারুফ অর্থাৎ পচ্ছন্দনীয় কাজে তোমরা ব্রতী হও এবং মুনকের অর্থাৎ অপচ্ছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত হও। সুতরাং, এই দুইটি কথা (১) মারুফ ও (২) মুনকের এমন ব্যাপক শব্দ যাহা শরীয়তের নিয়মকে মনের আলোকে আলোকিত করিয়া দিয়াছে। এই শিক্ষা দ্বারা প্রতিক্ষেত্রে ভাবিতে হয় যে,প্রকৃত পুণ্য কি? দৃষ্টান্তস্থলে, কোন ব্যক্তি আমাদের প্রতি অন্যায় করিল, তাহাকে প্রহার করা ভাল, না ক্ষমা করা ভাল? কোন প্রার্থী আমাদের নিকট হাজার টাকা এই উদ্দেশ্যে চাহিল যে, সে এই টাকা দিয়া ধুমধামের সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ দিবে, বাজি পোড়াইবে, গায়িকাদের ও বাদ্যাদি সহ তাহার পারিবারিক প্রথাগুলি অনুসারে প্রথা পালন

* 'ঈসা আলাইহেস্ সালাম' যীশু খ্রীষ্ট মশীহ।—সম্পাদক আহ্‌মদী।

করিবে, তখন আমরা হাজার টাকা তাহাকে দিতে পারিলেও মা'রূফের আদেশ ও 'মুনকের' এর প্রতিরোধের নীতি অনুযায়ী আমাদের ভাবিতে হইবে যে এই প্রকার বদান্যতা আমরা কাহার সাহায্যার্থে করিতেছি? বস্তুতঃ, এই প্রকারেই কোরআন শরীফ আমাদের ধর্ম ও সাংসারিক মঙ্গলার্থে আমাদের প্রত্যেক ভাল কাজে ক্ষেত্র ও উপযোগিতার বাঁধন সংযোজিত করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সিরাজউদ্দীন সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিতেছি; আমি লিখিয়াছি যে, ইস্‌লাম তৌহীদ স্বীকার করাইবার জন্য ইহুদীদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করে নাই বরং ইসলামের বিরুদ্ধবাদিগণ নিজেরা নানা উপদ্রব দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের কারণ ঘটাইয়াছিল। কেহ কেহ মুসলমানদিগকে হত্যা করিবার জন্য প্রথম অস্ত্র ধারণ করে এবং তাহাদিগকে কেহ কেহ সাহায্য করে। কেহ কেহ ইস্‌লামের প্রচার রোধ করিবার জন্য অন্যায় চাপ দিতে থাকে। অতএব, এই সকল কারণে বিদ্রোহীদের দমন, দণ্ড ও অন্যায়ের প্রতিরোধার্থে খোদা-তা'লা এই সকল অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। আর এই কথা বলা যে, আঁ-হযরত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তের বৎসর পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধ করেন নাই যে, তখন পর্যন্ত পুরাপুরি দল গঠিত হয় নাই, ইহা শুধু অত্যাচার মূলক ও অশান্তিকর ধারণা মাত্র। যদি ইহাই অবস্থা হইত যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের বিরুদ্ধবাদিগণ ১৩ বৎসর পর্যন্ত ঐ সকল অত্যাচার ও রক্তপাত হইতে নিবৃত্ত থাকিত, যাহা মক্কায় তাহারা করিয়াছিল, এবং ষড়যন্ত্র পূর্বক তাহারা নিজেরাই এই প্রস্তাব যদি গ্রহণ না করিত যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহেস্‌ সাল্লামকে হত্যা করিতে হইবে বা দেশত্যাগী করিতে হইবে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম শত্রুদের আক্রমণ ছাড়া মিজে নিজেই মদীনার দিকে গমন করিতেন, তবে এই প্রকার কুধারণা করার কারণ থাকিত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণও জানে যে তের বৎসর সময়ের মধ্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম শত্রুদের সর্ব প্রকার কঠোরতায় স্বয়ং ধৈর্য ধারণ করেন এবং সাহাবাগণের উপর কড়া তাগিদ দেন যেন তাহারা অন্যায়ের মুকাবিলা না করেন। বিরুদ্ধচারিগণ অনেক হত্যাকাণ্ড করে এবং মুসলমানদিগকে তাহারা যে রকম মারধর এবং গুরুতর জখম করে তাহার কোন হিসাব ছিল না। অবশেষে তাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করে। এই—রূপ সময়ে খোদা তাঁহার নবীকে শত্রুদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া মদীনায় পৌঁছাইয়া দেন এবং সুসংবাদ দেন যে, যাহারা তরবারি ধরিয়াছে, তাহাদিগকে তরবারি দ্বারাই ধ্বংস করিতে হইবে। সুতরাং, একটু বুদ্ধি ও ন্যায়-

পরায়ণতা নিয়া চিন্তা করুন যে, এই রুইদাদ হইতে কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের যখন কিছু দলবল হইল তখন তাহার মনের পূর্ব হইতে সঞ্চিত যুদ্ধেরসংকল্প প্রকাশিত হইয়া পড়িল? পরিতাপ! শত পরিতাপ!! খ্রীষ্ট ধর্ম সমর্থক-গণ ধর্ম-বিদ্বেষে কোথা হইতে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে? ইহাও চিন্তা করে নাই যে, মদীনায় যাওয়ার পর মক্কাবাসীদের পশ্চাদ্ধাবনের ফলে যখন বদরের যুদ্ধ হইল—যাহা ইস্‌লামের প্রথম যুদ্ধ—তখন কোন দলবলের সৃষ্টি হইয়াছিল? তখনতো সর্বমোট ৩১৩ জন মুসলমান ছিলেন। যাহারা বদর রণাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বালক এবং অনভিজ্ঞ ছিলেন। অতএব, ভাবিবার কথা, ঈদৃশ মুষ্টিমেয় লোকের উপর নির্ভর করিয়া আরবের সকল বীর, ইহুদী ও খ্রীষ্টান এবং লক্ষ লক্ষ জনগণকে দমন করার উদ্দেশ্যে রনাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে কাহারো সুস্থ বুদ্ধি কি কখনও পরামর্শ দিবে? ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উল্লিখিত অভিযান সেই সকল ব্যবস্থা ও সংকল্পের ফল নহে যাহা মানুষ শত্রুর বিনাশ ও নিজের জয়ের জন্য চিন্তা করিয়া থাকে। কারণ এইরূপ হইলে অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী একত্রিত করা জরুরী ছিল। ইহার পর আবার লক্ষ লক্ষ মানুষের মুকাবিলা করা। এইসব হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এই যুদ্ধ অনোন্যা-পায় অবস্থায় খোদা-তা'লার আদেশে করা হইয়াছিল, বাহ্যিক উপকরণের ভরসায় নহে।

এস্থলে আরো এক আপত্তি খণ্ডণ করা প্রয়োজন এবং তাহা এই, যদি তৌহীদ ও পুণ্য কর্ম ('আমলে সালেহ') যাহা খোদার প্রেম ও ভয়ে সম্পাদিত হয় তাহা মুক্তির উপায় হইয়া থাকে, তবে ইহুদীদিগকে ইস্‌লামের দিকে আহ্বান করা হইয়াছে কেন? ইহুদীদের মধ্যে কি এমন কেহই ছিল না যে কার্যতঃ তৌহীদ পালন করিতে পারিত এবং খোদার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত?

ইহার উত্তর এই যে, আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের আবির্ভাবের সময় অধিকাংশ ইহুদী ও খ্রীষ্টান ঈশ্বর-আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী ও পাপাসক্ত ছিল, যেমন কোরআন শরীফ স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়

و اكثرهم فاسقون

"ও আক্‌সারাহুম্ ফাসেকূন"

সুতরাং, যেহেতু তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই 'ফাশিক' (ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘনকারী ও পাপাসক্ত) ছিল, যাহারা কার্যতঃ তৌহীদের সম্মান করিত না এবং সৎকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল, এ জন্য খোদার দয়া, তাহাদের সংশোধনের জন্য, উহার চিরাচরিত নিয়মানুসারে ইহাই তাগিদ করিল যে তাহাদের নিকট যেন রসুল পাঠান হয়। অতঃপর, যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে তাহাদের মধ্যে কচ্চিৎ কেহ তৌহীদ ভক্ত ও সাধু ছিল, খোদার রসুলের বিরুদ্ধাচরণের ফলে,

সাধু থাকে নাই। যখন সামান্য পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে, তখন কিরূপে ধারণা করা যায় যে, খোদার রসুলের অমান্যকারী ও তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী পবিত্রচিত্ত থাকিতে পারে?

তৃতীয় প্রশ্ন

মানুষ ও খোদার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার বিষয়ে এবং মানুষের সহিত খোদা কি ভাবে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করেন সে বিষয়ে কোরআনে কি আয়াত আছে, যাহাতে বিশেষভাবে 'মহব্বত' বা 'হুব-'এর ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হইয়াছে?

উত্তর

জানা উচিত কোরআন শরীফের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে খোদা যেমন 'ওয়াহেদ লা শরীক,' এক ও অংশীবিহীন তেমনি তোমার প্রেমের দিক দিয়াও তাঁহাকে তুমি 'ওয়াহেদ লা শরীক' প্রতিপন্ন কর, যেমন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা যাহা সব সময় মুসলমান আবৃত্তি করিয়া থাকে, ইহারই প্রতি সংকেত করে। কারণ 'ইলাহ' (اله) ولہ ধাতু হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ এমন প্রাণবল্লভ ও প্রিয়, যাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই কলেমা, তৌরীত ও শিক্ষা দেয় নাই এবং ইঞ্জীলও দেয় নাই, শুধু কোরআন শরীফ ইহা শিক্ষা দিয়াছে। ইস্‌লামের সহিত এই কলেমার এরূপ সম্বন্ধ যেন ইহা ইস্‌লামের পদক স্বরূপ। এই কলেমাই পাঁচ ওয়াক্ত মস্‌জিদের মিনারা হইতে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করা হয়। খ্রীষ্টান ও হিন্দু তাহাতে চটে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রেমভরে খোদাকে স্মরণ করা তাহাদের নিকট পাপ। ইহা ইস্‌লামেরই বিশেষত্ব যে প্রভাত হওয়া মাত্র ইস্‌লামী মুয়াজ্জিন উচ্চৈস্বরে বলে: 'আশ্‌হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' —অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে কেহ আমাদের প্রিয়, দয়িত ও উপাস্য, আল্লাহ্ ছাড়া নাই। তারপর দ্বিপ্রহরের পর এই ধ্বনিই ইস্‌লামী মসজিদগুলি হইতে আসে। তারপর, আসরের সময়েও এই ধ্বনি, আবার মগরেবেও এই ধ্বনি, আবার এশাতেও এই ধ্বনিই উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হয়। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে কি এ দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়?

অতঃপর, ইস্‌লাম শব্দের অর্থও প্রেম নির্দেশ করে। কারণ খোদা-তা'লার সম্মুখে মস্তক স্থাপন ও সত্য প্রাণে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হওয়া, যাহা ইস্‌লামের অর্থ এরূপ এক আম্‌লী বা ব্যবহারিক অবস্থা যাহা প্রেমের প্রস্রবন হইতে নির্গত হয়। 'ইস্‌লাম' শব্দ দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, কোরআন শরীফ শুধু মৌখিক ভাবে প্রেমকে সীমাবদ্ধ করে নাই, বরং ব্যবহারিক ভাবেও প্রেম ও আত্ম উৎসর্গের পন্থা শিক্ষা দেয়। পৃথিবীতে অন্য আর কোন ধর্ম আছে কি, যাহার

প্রবর্তক উহার নাম 'ইস্‌লাম' রাখিয়াছেন? ইসলাম অত্যন্ত প্রিয় শব্দ। সত্য পরায়ণতা, আন্তরিক নিষ্ঠা ও প্রেমের ভাব এই শব্দের অর্থে ভরপুর। সুতরাং ধন্য ঐ ধর্ম, যাহার নাম ইস্‌লাম। সেইরূপ, খোদার প্রেম সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা বলেন:

والذين امنو اشد حبا لله

অর্থাৎ, ঈমানদার সেই ব্যক্তি, খোদা যাহার নিকট সব চেয়ে প্রিয়'। তারপর এক স্থানে বলা হইয়াছে:

فاذ كروا الله كذكركم اباء كم او اشد ذكرا

অর্থাৎ, 'খোদাকে সেই ভাবে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতাকে স্মরণ করিয়া থাক, বরং ততোধিক প্রেমের সহিত স্মরণ করিবে'। তারপর একস্থানে বলা হইয়াছে:

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين -

অর্থাৎ "যাহারা তোমার অনুবর্তিতা করিতে চায় তাহাদিগকে বল, 'আমার কোরবানী, আমার মরণ ও আমার জীবন সকলই আল্লাহ্-তা'লার জন্য'। যে আমার অনুবর্তিতা করিতে চায়, তাহাকেও এই কোরবানী করিতে হইবে।" তারপর এক স্থানে বলা হইয়াছে, "যদি তোমরা তোমাদের প্রাণ, তোমাদের বন্ধু, তোমাদের বাগান ও ব্যবসায়কে খোদা ও তাঁহার রসুল অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া মনে কর, তবে পৃথক হইয়া পড়, যে পর্যন্ত না খোদা-তা'লা মীমাংসা করেন।" সেইরূপ এক স্থানে বলা হইয়াছে:

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتما و اسيرا - انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا -

অর্থাৎ, "তাহারাই মুমেন, যাহারা খোদার প্রেমে মিস্‌কীন, এতীম ও বন্দীদিগকে খাবার দেয় এবং তাহাদিগকে বলে: 'আমরা শুধু খোদার প্রেমে ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে দিই। আমরা তোমাদের দিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং কৃতজ্ঞতাও চাহি না'।"

বস্তুতঃ, কোরআন শরীফ এই প্রকার আয়াতে ভরা, যেখানে লিখিত আছে যে তোমরা তোমাদের কথা ও কার্যের দ্বারা খোদার প্রেম প্রদর্শন কর এবং সব চেয়ে অধিক খোদাকে প্রেম কর। এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ হইতেছে কোরআন শরীফে কোথায় লিখিত আছে যে খোদাও মানুষকে প্রেম করেন? অবহিত হউন, কোরআন শরীফে এই প্রকার বহু আয়াত আছে যে, 'খোদা তাওবাকারীদিগকে* ভালবাসেন,

* খোদার প্রেম মানুষের প্রেমের ন্যায় নয়। মানুষের প্রেমে বিরহ দ্বারা ব্যথা ও কষ্টানুভব আছে। খোদার প্রেমের অর্থ তিনি পুণ্যাচারিগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন যেমন প্রেমিক ব্যবহার করিয়া থাকে। (গ্রন্থকার)

খোদা সদাচারীদিগকে ভালবাসেন', এবং 'খোদা ধৈর্যাবলম্বীদিগকে প্রেম করেন'। অবশ্য, কোরআন শরীফে ইহা কোথাও লিখিত নাই যে, যে ব্যক্তি কুফর, অসদাচার ও অত্যাচারপ্রিয়, খোদা তাহাকেও প্রেম করেন। এস্থলে তিনি 'অনুগ্রহ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন তিনি বলিতেছেন :

وما ارسلنك الا رحمة للعالمين

অর্থাৎ, "সমগ্র বিশ্বের প্রতি দয়া করিয়া আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি।" 'আলামীন' (সমগ্র বিশ্ব) শব্দের মধ্যে 'কাফের' (অবিশ্বাসী) 'বেইমান' (অসাধু), 'ফাসেক' (খোদার সহিত প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী) ও ফাজের (পাপী) আছে এবং তাহাদের জন্য রহমতের দরজা এভাবে খোলা হইয়াছে যে, তাহারা কোরআন শরীফের নির্দেশ পালন করিয়া 'নাজাত' লাভ করিতে পারে। আমি একথাও স্বীকার করি যে কোরআন শরীফে মানুষের প্রতি খোদার প্রেমের এমন কোন উল্লেখ নাই যে, তিনি তাঁহার কোন পুত্রকে পাপীদের পাপের পরিবর্তে ক্রুশে দিয়াছেন এবং তাহাদের অভিশাপ তাঁহার প্রিয় পুত্রের উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন। খোদার পুত্রের উপর 'লানৎ' নাউজুবিল্লাহ্ খোদার উপরই 'লানৎ'। কারণ পিতা ও পুত্র অভিন্ন নহেন। ইহা অতি সুস্পষ্ট যে 'লানৎ' ও ঈশ্বরত্ব একত্রিত হইতে পারে না। তারপর ইহাও ভাবিয়া দেখার বিষয় যে, খোদা দুনিয়ার সব পাপীদের প্রতি এ কিরূপ প্রেম দেখাইলেন যে সাধুকে বধ করিয়া দুষ্টকে প্রেম করিলেন। ইহা এমন এক আচরণ, যাহা কোন পুণ্যাত্মা অনুসরণ করিতে পারেন না।

এই প্রশ্নের তৃতীয় অংশ হইল কোরআন শরীফে কোথায় ইহা লিখিত আছে যে মানুষ মানুষকে প্রেম করিবে ? ইহার উত্তর এই যে কোরআনে এরূপ ক্ষেত্রে প্রেমের পরিবর্তে 'দয়া' ও 'সহানুভূতি' সূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ 'প্রেম' শব্দ প্রকৃত পক্ষে খোদার জন্য ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দ।* মানব জাতির জন্য প্রেমের পরিবর্তে খোদার কালাম 'দয়া' (رحم) ও 'অনুগ্রহ' (احسان) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ পূর্ণ প্রেম 'পূজা' চায় এবং পূর্ণ 'দয়া' সহানুভূতি, চায়। এই প্রভেদটি অন্য জতিরা বুঝিতে পারে নাই। তাহারা খোদার 'হক' অন্যকে দিয়াছে। আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, যীশুর মুখ হইতে এইরূপ 'শেরেক' পূর্ণ শব্দ বাহির হইয়াছে। আমার ধারণা পরে এই ঘৃণিত শব্দ ইঞ্জীলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার পর অযথা যীশুর দুর্নাম করা হইয়াছে।

---

*'প্রেম' (محبت) শব্দ যেখানেই মানুষের পারস্পারিক সম্বন্ধের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে প্রকৃত প্রেম বুঝায় না। বরং ইস্‌লামী শিক্ষার দিক হইতে 'প্রকৃত প্রেম' শুধু খোদার জন্য খাস এবং অন্য যাবতীয় প্রেম অপ্রকৃত ও বাসনাজাত।

(গ্রন্থকার)

বস্তুতঃ, খোদার পবিত্র বাণীতে মানব জাতির জন্য 'রহম' বা 'দয়া' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন তিনি বলিয়াছেন :

تواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة

অর্থাৎ, "তাহারাই মুমেন, যাহারা সত্য ও দয়ার উপদেশ দেয়।" অন্যত্র বলা হইয়াছে :

ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى -

অর্থাৎ, "খোদার আদেশ এই যে' তোমরা জন সাধারণের প্রতি ন্যায়পরায়ন হইবে এবং ইহার উর্ধ্বে তোহরা দয়াপরবশ হইবে এবং ইহার ও উর্ধ্বে তোমরা মানব জাতির প্রতি এরূপ সহানুভুতিশীল হইবে যেমন কোন নিকটাত্মীয়ের প্রতি নিকটাত্মীয় সহানুভুতি দেখাইয়া থাকে।

এখন চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর শিক্ষা আছে, যাহার মধ্যে সমগ্র মানব জাতির সহিত সদাচারকে শুধু দয়াতেই সীমাবদ্ধ রাখে নাই, পরন্তু মনের সহজাত ভাবাবেগের মার্গ যাহাকে 'ইতায়ে জিল' কুরবা অর্থাৎ আত্মীয়তার টান বলা হয়। উহাও উক্ত শিক্ষার ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত। কারণ অনুগ্রহকারী যদিও অনুগ্রহের সময় একটা পুণ্য কর্ম করে, কিন্তু সে প্রতিফল ও প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা করে। এ জন্য সে কখনও অনুগ্রহ অস্বীকারকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারে এবং কখনও উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া তাহার অনুগ্রহও স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক প্রেরণায় পুণ্যাচার যাহাকে কোরআন নিকটাত্মীয়ের প্রতি টানের সহিত তুলনা করি.. য়াছে', উহা প্রকৃতপক্ষে শেষ সীমানার পুণ্য, যাহার পর পুণ্যের আর কোন মার্গ নাই। কারণ সন্তানের প্রতি মাতার সেবা ও করুণা একটা স্বাভাবিক বৃত্তি এবং অসহায় দুগ্ধপোষ্যের নিকট হইতে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতার দাবী নাই।

সেইরূপ তৌরীতের সম্মুখে শুধু ইহুদী ছিল। তৌরীতের শিক্ষার চরম বিকাশ ইহুদীদের প্রয়োজন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যে ব্যবস্থা সর্বজনীন ন্যায়পরায়ণতা, দয়া ও সহানুভুতির জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহা শুধু কোরআন শরীফ। আল্লাহ্-তা'লা বলেন

قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعا

অর্থাৎ, "বল, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের দিকট রসুলরূপে প্রেরিত হইয়াছি।" তারপর বলেন :

وما ارسلنك الا رحمة للعالمين

অর্থাৎ, "আমরা সমগ্র বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছি।"

চতুর্থ প্রশ্ন

মসিহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।"[১] আরো বলিয়াছেন:

"আমি (জগতের) জ্যোতি"[২] "আমিই পথ' ও সত্য ও জীবন।"[৩]

ইসলাম প্রবর্তক কি এই বাক্যগুলি বা ইহাদের অনুরূপ বাক্য তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন?

উত্তর

قل ان كنتم تحبون الله فا تبعو نى يحببكم الله الخر

অর্থাৎ, "তাহাদিগকে বলঃ 'যদি খোদাকে প্রেম কর, এস আমার অনুবর্তিতা কর, যাহাতে খোদাও তোমাদিগকে প্রেম করেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন।" 'আমার অনুবর্তিতা দ্বারা মানুষ খোদার প্রিয় হইয়া পড়ে', এই যে প্রতিশ্রুতি ইহা যীশুর পূর্বোক্ত সব কথাগুলিকে নিস্প্রভ করিয়া দিয়াছে। কারণ খোদার প্রিয় হওয়া অপেক্ষা মানুষের বড় কোন মর্যাদা নাই। সুতরাং যাঁহার পথে চলিয়া মানুষ খোদার প্রিয়জনে পরিণত হয়, তাঁহার চেয়ে নিজকে "জ্যোতি" বলিয়া অভিহিত করার বড় অধিকার কাহার? এই জন্য আল্লাহ্ জল্লাহ্ শানুহু কোরান শরীফে আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের নাম 'নূর' রাখিয়াছেন, যেমন তিনি বলেনঃ

قد جاء كم نور من الله

অর্থাৎ, "তোমাদের নিকট খোদার 'জ্যোতি' আসিয়াছেন।" আর এই যে উক্তি:

"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকসকল আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।"

ইহা ফাঁকা কথা বলিয়া মনে হয়! যদি বিশ্রাম অর্থ পার্থিব বিশ্রাম ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন সন্দেহ নাই যে এই উক্তি সত্য। কারণ মুসলমান 'মুসলমান' হইলে তাহাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িতে হয়। প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রভাতের নামাযের জন্য উঠিতে হয় এবং শীত ঋতুতে পানি যতই ঠাণ্ডা হউক তাহা দিয়া অযু করিতে হয়। তারপর পাঁচ বেলা মসজিদের দিকে 'জামাআত নামাযের' জন্য দৌড়াইতে হয়। আবার প্রায় এক প্রহর রাত্রি বাকী থাকিতে মধুর ঘুম ছাড়িয়া 'তাহাজ্জদ নামায' পড়িতে হয়। পর স্ত্রী দেখা হইতে আত্ম রক্ষা করিতে হয়। মদ ও সব রকমের নেশা হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে হয়! প্রতি বৎসর একাদিক্রমে ৩০ বা ২৯ দিন রোযা

(১) 'মথি,' ১১ : ২৮;
(২) 'যোহন,' ৮ : ১২;
(৩) 'যোহন' ১৪ : ৬ —সঃ আহ্‌মদী

খোদার হুকুমে রাখিতে হয় এবং যাবতীয় আর্থিক, দৈহিক ও আত্মিক এবাদত করিতে হয়। তারপর কোন দুর্ভাগা, যে ইতিপূর্বে মুসলমান ছিল, খ্রীষ্টান হইলে এই সব বোঝা নিজের মাথা হইতে নামাইয়া ফেলে এবং নিদ্রা, আহার, মদ্যপান ও আপনাকে 'বিশ্রাম' দেওয়া তাহার কাজ হয়। হঠাৎ সব কঠিন ধর্ম-কর্ম হইতে ক্ষান্ত হইয়া পশুর ন্যায় পানাহার ও নাপাক বিলাসিতা ছাড়া তাহার আর কোনই কাজ থাকে না। সুতরাং, যদি যীশুর উপ-রোক্ত 'বিশ্রাম' দিবেন, কথার ইহাই অর্থ হইয়া থাকে, তবে আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে প্রকৃতই খ্রীষ্টানগণ এই কয় দিনের পার্থিব জীবনে একান্ত বাঁধন হারা বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। এমন কি, পৃথিবীতে তাহাদের নজীর নাই। তাহারা মাছির ন্যায় সব জিনিষের উপরই বসিতে পারে এবং শূকরের ন্যায় সব জিনিষই খাইতে পারে। হিন্দু গরু পরহেজ করে। মুসলমান শূকর হইতে দূরে থাকে। কিন্তু ইহারা এই দুইই অবাধে হজম করে। 'খ্রীষ্টান হও, যাহা চাও কর'। সত্য কথা এই যে শূকরকে নিষিদ্ধ নির্ধারণে তৌরীতে কত কড়া তাগিদ ছিল। এমন কি, ইহাকে স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ছিল। পরিষ্কার লিখিত ছিল যে, ইহা চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহারা এই শূকরকেও ছাড়ে নাই, যাহা সব নবীগণের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ছিল। যীশু মদ্যপায়ী 'শরাবী-কাবাবী' হওয়া যদি আমরা ধরিয়াও লই, কিন্তু তিনি কি কখনও শূকর মাংস খাইয়াছিলেন? তিনি এক দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন, "তোমাদের মুক্তা শূকরদিগের সম্মুখে ফেলিও না।"[১] সুতরাং, যদি 'মুক্তা' দ্বারা পবিত্র বাক্যকে বুঝায় তবে 'শূকরদিগের' দ্বারা অপবিত্র ব্যক্তিকে বুঝায়। এই দৃষ্টান্তে যীশু পরিষ্কার সাক্ষী দিতেছেন যে, শূকর অপবিত্র কারণ 'উপমান' ও 'উপমেয়' উভয়ের সামঞ্জস্য থাকা শর্ত।

বস্তুতঃ খ্রীষ্টানগণ যে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতা মূলক বিশ্রাম। কিন্তু আধ্যাত্মিক 'বিশ্রাম' যাহা খোদার মিলনে লাভ করা যায়, উহার সম্বন্ধে আমি খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই খ্রীষ্টান জাতি উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। তাহাদের চোখের উপর পর্দা ও তাহাদের হৃদয় মৃত এবং তাহারা আঁধারে নিপতিত। ইহারা প্রকৃত খোদা সম্বন্ধে একেবারে গাফিল এবং এক জন দুর্বল মানুষ, অনাদি সত্তার সম্মুখে যে কিছুই নয়, তাহাকে অযথা খোদা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আশীষ নাই। তাহাদের মধ্যে চিত্ত-জ্যোতি নাই। প্রকৃত খোদার প্রেম তাহাদের নাই। বরং সেই প্রকৃত খোদার পরিচয়ই তাহাদের নাই। তাহাদের মধ্যে কেহই নাই, এমন কি এক জনও নাই—যাহার মধ্যে ঈমানের লক্ষণ পাওয়া যায়। যদি ঈমান সত্যই কোন 'নেমাৎ' হইয়া থাকে

(১) মথি, ৭:৬ পদ —সঃ 'আহ্‌মদী'

তবে নিশ্চয়ই ইহার লক্ষণও থাকিতে হইবে। কিন্তু কোথায় আছে এমন খ্রীষ্টান, যাহার মধ্যে যীশুর বর্নিত লক্ষণরাজি পাওয়া যায় অতএব, হয় ইঞ্জীল মিথ্যা নচেৎ খ্রীষ্টানগণ মিথ্যাবাদী।

দেখুন, কোরআন শরীফে ঈমানদারগণের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, উহা প্রতি যুগেই পাওয়া গিয়াছে। কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঈমানদার এলহাম পাইয়া থাকে। ঈমানদার খোদার শব্দ শোনে। ঈমানদারের দোয়া সব চেয়ে অধিক কবুল হয়। ঈমানদারের নিকট গায়েবের (ভবিষ্যতের) খবর প্রকাশ করা হয়। ঈমানদারের সহিত স্বর্গীয় সাহায্য থাকে। পূর্ববর্তী যুগ সমূহে যেমন এই সকল লক্ষণ পাওয়া যাইত, এখনও তেমনই যথারীতি পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোরআন শরীফ খোদার পবিত্র কালাম এবং কোরআনের ওয়াদা খোদার ওয়াদা। হে খ্রীষ্টানগণ! উঠিয়া দাঁড়াও! যদি তোমাদিগের শক্তি থাকে আমার মোকাবিলা কর। আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকিলে আমাকে নিশ্চয় জবেহ করিয়া দাও। নচেৎ তোমরা খোদার অভিযোগের নীচে রহিয়াছ এবং জাহান্নামের আগুণের উপর তোমাদের পা রহিয়াছে।

والسلام على من اتبع الهدى

[যে সৎপথে চলে, তাহার প্রতি শান্তি হউক]

লিখক,
খাকসার—মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ,
কাদিয়ান, জিলা গুরুদাসপুর,
২২শে জুন, ১৮৯৭ সন।

উর্দূ পত্রিকা পড়তে চান? পড়ুন, 'দৈনিক আল্-ফজল', মাসিক 'আল্-ফুরকান',

ঠিকানা—রাবওয়াহ্
জিলা—ঝঙ্গ
পঃ পাক ঃ

ত্রিত্ববাদ

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

লাকাদ কাফারাল্লাজিনা কালু ইন্নাল্লাহা ছালিছু ছালাছাতিন, ওমা মিনইলাহিন ইল্লা ইলাহুঁউ ওয়াহিদ।

> তাহারা নিশ্চয়ই কাফির যাহারা বলে, আল্লাহ হইলেন তিনের মধ্যে তৃতীয়; অথচ আর কোন ঈশ্বরই নাই, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। (সুরা মায়েদা' ৭৪ আয়াত)

ত্রিত্ববাদ খ্রীষ্ট ধর্মের একটি প্রধান স্তম্ভ। পিতা ঈশ্বর; পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর; এই তিন ঈশ্বরের প্রত্যেকই পূর্ণ ঈশ্বর এবং এই তিন ঈশ্বর মিলিত ভাবে এক পূর্ণ ঈশ্বর। অর্থাৎ, খ্রীষ্টানদের তিন বিশ্বাস এমনই অদ্ভুত যে, স্বয়ং শুভঙ্করও ইহার ফল মিলাইতে পারিবেন না। ১+১+১=৩ ইহাই স্বাভাবিক ফল; কিন্তু খ্রীষ্টান ভায়াদের নিকট এই অঙ্কটির ফল ১+১+১=১ হয়। এই হিসাব শুধু খৃষ্টের বেলা। তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১+১+১=৩ ঠিক আছে। পবিত্র কোরআন এই ভ্রান্ত এবং অদ্ভুত বিশ্বাসটিকে খণ্ডন করিয়াছে। এখন বাইবেল দ্বারাও এই মিথ্যা বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করিব।

যীশু কখনও তিন ঈশ্বরের কথা প্রচার করেন নাই বরং সর্বদা তিনি একত্ববাদ বা তৌহিদই প্রচার করিতেন। যীশুর সর্বপ্রথম আদেশটি এই, 'হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু, একই প্রভু।' (মার্ক, ১২:২৯)। অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের পিতা একজন, তিনি সেই স্বর্গীয়।' (মার্ক, ২৩:৯)। যীশু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, 'আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাহাকে পাঠাইয়াছ, তাহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে জানিতে পায়।' (যোহন, ১৭ঃ৩)। যীশুর নূতন নিয়ম বলে, 'এবং ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই·····আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা।'

(১ করিন্থীয়, ৮ঃ৪,৬)।

'আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত, ইহা প্রভু ঈশ্বর কহিতেছেন।'

(প্রকাশিত বাক্য, ১ঃ৮)।

'পুরাতন নিয়মে', সর্বত্র এক ঈশ্বরের বিষয় উল্লেখ আছে। নিম্নে মাত্র কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিলাম।

ঈশ্বর বলেন, 'আমার সাক্ষাতে বা ব্যতিরেকে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।'

(যাত্রা, ২০:৩)। 'হে ইস্রায়েল শুন ; আমাদের ঈশ্বর সদা প্রভু একই সদাপ্রভু।'

(দ্বিতীয় বিবরণ, ৬ : ৪)।

সদা প্রভু কহেন,—

'আমার পূর্বে কোন ঈশ্বর নির্মিত হয় নাই, এবং আমার পরেও হইবে না। আমি, আমিই সদাপ্রভু ; আমি ভিন্ন আর ত্রানকর্ত্তা নাই।'

(যিশহিয়, ৪৩ : ১০,১১)

'আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।'

(ঐ, ৪৪ : ৬)

'আমিই সদা প্রভু, আর কেহ নয় ; আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই।'

(ঐ, ৪৫:৫)

'কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয় ; আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই।'

(ঐ, ৪৫:৯)।

বাইবেলের এই সকল স্পষ্ট উক্তির বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানগণ ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আমদানী করিয়া সত্য ধর্ম হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।

পাকিস্তানে খ্রীষ্টানের সংখ্যা

উভয় অংশে সর্বমোট ৭,৩২,৭৮৭ জন।

পশ্চিম পাকিস্তান— মোট ৫,৮৩,৮৮৪ জন।
পুরুষ—৩,১২,৯৪২ জন।
নারী—২,৭০,৯৪২ জন।

পূর্ব পাকিস্তান— মোট—১,৪৮,৯০৩ জন।
পুরুষ— ৭৪,৯৭৫ জন।
নারী— ৭৩,৯২৮ জন।

নবযুগ, ২৯ বর্ষ ২১৩ সংখ্যা জুলাই ১৯৬২ ইং

"পূর্ব পাকিস্তানে খ্রীষ্টানের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। প্রোটেষ্টেন্ট মনে হয় ৬০ হাজারের কম নয়।"

নবযুগ, ২৯ বর্ষ ২১৪ সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৬২ ইং

[মুসলমানগণের কতখানি সচেতন হওয়া প্রয়োজন ; উপরে বর্ণিত খ্রীষ্টানদের প্রচারের তৎপরতা হইতে বুঝা উচিত। আল্লাহ্-তা'লা কর্তৃক নিয়োজিত 'কাসেরুস্-সালীব' (ক্রুশ-ভঙ্গ-কারী) প্রতিশ্রুত মসিহের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত মুসলমান কখনও ক্রুশ ধর্মের বিপদ হইতে রক্ষা লাভ করিতে পারিবে না এবং ইস্‌লামের বিজয়ও সম্ভবপর নয়।] —সঃ 'আহ্‌মদী'

—যুগের মেহদী এসো—

—লতাফত হুসেন

(মাসিক 'কোরআন প্রচার' ১৪ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ; কলিকাতা হইতে)

এ অধঃপতন কেন তাদের ?
কত মুজাদ্দিদ এল যাদের
চৌদ্দশ' বছরে এই ভবে ?
গওস কুতুব ওলী আব্‌দাল ;
ধরনীর বুকে ভ্রমে সদাকাল ;
এ পদস্খলন কেন তবে ?
প্রত্যহ যাদের চলে তবলীগ,
তারা কেন হেন হারা দিগ্বিদিগ ?
বল্গা ছেঁড়া ঘোড়ার মত ?
দ্বীন ঈমান আর আখেরাত তরে,
ফজর মগরেবে, যারা প্রতি ঘরে
হাদিস কোরআন তেলওয়াত রত ?
খোদা ছাড়া যারা করেনা প্রণতি,
তাদের কেন এ অধোগতি ?
যান, গাছ তলে পড়ে ধোঁকে ?
ইটের টীপি ও দরগা কবর,

দেখলে কোথাও, হ'য়ে বে-খবর,
লুটায় সে থাকি পা'বার ঝোঁকে ?
মসজেদ হতেছে জঞ্জাল স্তূপ !
পীরের কবরে জ্বালে বাতি ধূপ !
এরাই মুসলীম তৌহীদবাদী ?
কোন দিন এরা ভাবে কি মনে,
এই ইসলাম এল কেমনে ?
কোথা এর মূল ? উৎস আদি ?
সালেক আসফা ওলী আবদাল,
আসেনি বিছাতে ভ্রান্তির জাল,
মুগ্ধ হ'য়ে শয়তানী ছলে,
কি হেতু তাদের অনুসারীগণ,
পতিত ভ্রষ্ট হ'য়ে এমন,
অধঃপতনের কুপথে চলে ?
পীর, আউলিয়া আসে যায় ভবে,
দেখাতে সুপথ ভ্রান্ত মানবে,
করিতে ধরাতে পুণ্য পীঠ।
কিন্তু, ক্ষেত্র ভেদে যে মেঘের জল,
আনে তৃণ, শষ্য, সব্জী, ফুল ফল,
সে নীরে বিষ্ঠায় জন্মে কীট !
জ্ঞান বিজ্ঞান যাদের সাধনা,
তাদের সম্বল আজ, প্রবঞ্চনা,
মিথ্যা, ব্যভিচার, গর্হিত কাজ !
শিক্ষাই যাদের নারী ও নরের
সম্পদ গৌরব সারা জীবনের,
মূর্খতা তাদের ভূষণ আজ !
ভ্রষ্ট ইবলিস জাত্যভিমান
রক্ত কনায় পেয়েছে স্থান !
তাই বুঝি তারা উচ্চ ও নীচ ;

মাংসাশী কত শিয়াল কুকুর,
তারাও পাবে কি ভেস্ত ও হুর?
মুসলিম খুঁজে মিলে কদিচ।
গর্দভ আরোহী, এক চোখো যত,
দাজ্জাল খেলে ভেল্কী নিয়ত,
স্বর্গ ও নরক লয়ে হাতে,
মূর্খ অজ্ঞ, ভ্রান্ত মানব,
লভিবে মুক্তি, শান্তি, বিভব,
ছুটিছে অবাধে সেই সাথে!
এই ভাবেই যদি চলে গতি
এদের ধ্বংস নিকট অতি,
মোরতাদ, মুশরিক রূপ ধরে!
যুগের মেহ্দী এসো, ওগো আজ,
বাঁচাও সুপ্ত মুমিনের লাজ,
প্রচারি' ইসলাম নূতন ক'রে।

ঃ ক্রয় করুন ঃ

১।	হায়াতে তাইয়েবা ১ম খণ্ড	৫·০০
২।	আহ্মদ চরিত	·৫০
৩।	কিশতিহে নুহ	১·২৫
৪।	খাতামুন নবীঈন	২·০০
৫।	আমাদের কথা	·৩৭
৬।	মহাসংবাদ	·২৫
৭।	মুসমাচার	·০৬
৮।	বিশ্বব্যাপী ইস্লাম প্রচার	·২৫

কবিকে সুসংবাদ

লক্ষ প্রাণের ব্যথিত বেদন কবির কবিতা মাঝে,
প্রতি পদে তাঁর মর্মবেদনা সকরুণ সুরে বাজে।
মুসলীমের অধঃপতন দেখিয়া কাঁদে যে কবি,
হৃদয়ের যত ব্যথা দিয়া আঁকে, কবিতায় তা'রি ছবি।
দুই হাত তুলি', মোনাজাত করে, আল্লার দরগায়
'নাশিতে আঁধার, পাঠাও মাহ্দী, আমাদের জমানায়'।
সুসংবাদ তাই, দিয়ে যাই আজি, ব্যাকুল কবির তরে,
মাহ্দীর খবর পৌঁছাইয়া দেই মানুষের ঘরে ঘরে।
এসেছেন মাহ্দী, যুগের ইমাম, জমানার শির ভাগে,
ঘুমন্ত জাতি, বেদনা বিভোর, পরশে তাঁহার জাগে।
এসেছেন 'আহ্মদ', হাদিস বর্ণিত, পবিত্র 'কাদয়া' ভূমে;
নব জীবন, লভিয়াছি মোরা, তাঁহারই হস্ত চুমে!
দজ্জাল যা'রা, পলাতক আজি, মাহ্দীর সেনা হেরি',
ইউরোপ-আমেরিকার ময়দানে ঐ বাজে, শুন রণ-ভেরী
আকাশে বাতাসে, ধ্বনিয়া উঠিছে, ইসলামের জয়গান;
কবিতায় আজি জানাই কবিরে মাহ্দীর আহ্বান।

ইতি—আবু আহ্মদ তবশির
সেলবর্সী।

'মিসবাহ', 'আনসারুল্লাহ্'র গ্রাহক হতে অনুরোধ করি।
ঠিকানা—রাবওয়াহ্
ঝঙ্গ
পঃ পাকঃ

পরকাল

মৌলবী মোহাম্মদ

(পূর্বাভাষ)

كل من عليها فان

"এ ভুবনে সকলই মরণশীল"

(সুরা রহমান, ২৭ আয়েত)

জীবের মৃত্যু আল্লাহ্-তা'লার অমোঘ নিয়ম। বিশ্বের সেরা সৃষ্টি মানব, যাহার সেবার জন্য বিশ্বের সকল কিছু সৃষ্ট, সেই মানবও মরণের অধীন। পৃথিবীর বুকে চিরদিন সর্ব্বত্র মরণের মেলা লাগিয়া আছে। ঘরে বাইরে, নিকটে দূরে সদা মানুষ মরিয়া চলিয়াছে এবং জীবিত যাহারা তাহারা দেখিয়া চলিয়াছে। মানুষ মরে, মানুষকে মরিতে হইবে, তবু মানুষ সদা এ মরণ মহফিলে বসিয়া একদিকে যেমন মরণ—ভীত অপরদিকে তেমনি মরণ—ভোলা।

মানুষ মরিতে কেন ভয় পায়? মরণের পর কি হয় তাহা বলিবার জন্য আজও মরণের ওপার হইতে কোন প্রত্যক্ষদর্শী ফিরিয়া আসে নাই। জাগ্রত জড়দেহ সহ পরলোকে যাইয়া সেখানকার অবস্থা আজও কেহ জানিয়া আসে নাই। তাই তাহার ভয়, মহা সংশয়, যদি মরণে সব শেষ হইয়া যায়, অথবা মরণের পর যদিও বা কিছু থাকিয়া থাকে, অজানার গভীর অন্ধকারের অন্তরালে না জানি কি মহা শঙ্কা ওপারে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই মানুষ মরিতে চায় না। সে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়। তাহার মধ্যে অমরত্বের আকুল পিপাসা। সেই পিপাসায়, মরণ দৃশ্যে, একদিকে স্বীয় মৃত্যু কল্পনায় তাহার আতঙ্ক, অমরত্বের আশায়, পরক্ষণেই সে মরণ-ভোলা।

জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য, সকল ক্ষুৎ-পিপাসা আল্লাহ্-তা'লার দ্বারা সৃষ্ট। আপন করুণায় তাই তিনি প্রকৃতির মধ্যে সকল ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহার যতখানি বিকাশ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহার ততখানি পিপাসা ও তাহার পিপাসা নিবারণের ততখানি আয়োজন। মানবেরও ছোট বড় পার্থিব সকল পিপাসা ও ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর আকারে প্রচুর হইতে প্রচুরতর পরিমাণে তিনি প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহার বাঁচিয়া থাকার পিপাসা, তাহার সকল পিপাসাকে সদা ছাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা, তাহাকে মরিতে হয়। সুতরাং বাহ্যত

তাহার বাঁচিয়া থাকার পিপাসার পূরণ নাই বলিয়া মনে হয়। তবে কি আল্লাহ্-তা'লা মানুষকে বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার ভীতি ও অমরত্বের পিপাসা দিয়া সৃষ্টি করিয়া, তাহার ভয় নিরশন ও পিপাসা নিবারণের কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। প্রকৃতির মাঝে সকল ছোট বড় পিপাসা নিবারণের উপকরণ আছে। শুধু কি সৃষ্টির সেরা মানবের সকল পিপাসার সেরা বাঁচিয়া থাকার পিপাসা পূরণের ব্যবস্থা নাই? তাহার প্রকৃতি কেন তবে সাক্ষ্য দিতেছে যে তাহার চিরকাল বাঁচিয়া থাকা উচিৎ?

আমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর অগ্রগতির ধারা ও পরিনতি অনুযায়ী তাহার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোন বস্তুর উন্নতির ধারা যেখানে থামিয়া যায়, উহাই তাহার সৃষ্টির গন্তব্যস্থল। গো বৎস বড় হইয়া একদিকে গাভী হইয়া দুগ্ধ দান ও অপর দিকে লাঙ্গল ও গাড়ী টানা ও ভারবহন করা এবং খাদ্য হিসাবে মানব সেবায় লাগা তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা ও পরে গাছে পরিণত হইয়া ফল দান করাই তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সৃষ্টির মাঝে প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীর এইরূপ এক নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য দেখা যায়। কিন্তু মানুষের বেলায় অন্যরূপ দেখি। তাহার গন্তব্য পথের শেষ নাই। মানুষ, দর্শন বিজ্ঞান, অঙ্ক, অর্থ, শিল্পকলা, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি জ্ঞানের চর্চ্চা করে। আবার কেহ ভোগ-বিলাসের নানা ধারায় গা ভাসাইয়া দেয়। কেহ থাকে ভ্রমন প্রিয়। দেশ হইতে দেশান্তর, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ভ্রমনের চিন্তায় বিভোর। ফলতঃ দেখা যায় মানব যে কোন চাওয়া ও পাওয়ার ধারায় অগ্রসর হয়—তাহার চাওয়া বস্তু লাভের সহিত তাহার পাওয়ার ক্ষুধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সে যত বেশী জ্ঞান লাভ করিতে থাকে, তাহার জ্ঞান লাভের পিপাসা তত বাড়িয়া যায়। সে যত বেশী সৌন্দর্য্য লাভ করে, সৌন্দর্য্যের পিপাসা তাহার তত বেশী বাড়িয়া চলে। সে ধন সম্পদ যত বেশী লাভ করিতে থাকে, তাহার ধন সম্পদের পিপাসা তত বেশী বাড়িয়া যাইতে থাকে। যত দেশ সে জয় করে, তত দেশ লাভ করিবার লালসা তাহার বাড়িয়া যায়। যত দেশ সে আবিষ্কার করে আরও দেশের সন্ধানে সে ব্যাকুল হয়। সমুদ্র সৈকতে দাঁড়াইয়া যখন সে সীমাহীন জলরাশি ও অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন জল ও আকাশের দৃশ্যমান অসীম-তাকে ছাড়াইয়া তাহার মন আর এক অদৃশ্য অসীমের দিকে ছুটিয়া যায়। আজ গ্রহ হইতে গ্রহে, তারকা হইতে তারকায় এবং বিশ্ব হইতে বিশ্বান্তরে যাইবার জন্য তাহার দৃষ্টি চঞ্চল হইতে চঞ্চলতর এবং প্রচেষ্টা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। অসীমের পিয়াসী সে, অসীমেই তাহার দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ।

প্রত্যেক বস্তুকে ক্রমঃ উন্নত ও অসীম আকারে পাইবার বাসনা তাহার অন্তরে নিহিত। যখনই তাহার পাওয়া সীমায় আসিয়া ঠেকে তখনই তাহার অতৃপ্তি। যে কোন জিনিষ সুন্দর হইতে সুন্দরতর, অধিক হইতে অধিকতর পাওয়ার বাসনার আগুন তাহার অন্তরে সততঃ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ইন্দিয় ও ভাবের কোন বাঁধনই তাহার মনকে বাঁধিতে পারে না। প্রত্যেক প্রসারতাই তাহার নিকট অপ্রশস্ত। ফলতঃ মানবের সকল বাসনা কামনাই কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সততঃ অনন্ত অসীমের দিকে সঙ্কেত লইয়া খাড়া আছে। যাহার মধ্যে অসীমের পিপাস, সে সীমাবদ্ধ জড়-পাওয়ায় কি ভাবে সন্তুষ্ট হইতে পারে। সে কোথাও থামিতে চায় না, থামে না। সে সকল বাধা বিঘ্নকে ঠেলিয়া সদা আগাইয়া চলে।

তাহার ক্ষুধার আহার অসীম অনন্তে বিস্তৃত। শিশুর মধ্যে যখন বৃদ্ধি হওয়ার জন্য খাদকবৃত্তি জাগ্রত হয়, তখন সে যাহা পায় তাহাই খায়। বিচার দ্বারা সঠিক খাদ্য নিরূপন পরে হয় এবং যখন তাহার বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তখন সে আর যাহা পায় তাহাই খায় না। তেমনি মানুষের মধ্যে চির বর্দ্ধমান বাসনাবলীর মাধ্যমে তাহার অমরত্বের পরিচয় বর্ত্তমান। তাহার প্রকৃতির মধ্যে তাহার অনন্তের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হওয়ার সন্ধান বিরাজমান। প্রত্যেক বস্তু ও ভাবের মধ্যে তাহাকে অসীম হাতছানি দিয়া ডাক দিয়াছে অমর জীবনের দিকে। যাহারা ইহ-জীবনে সেই অনন্তের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়াছে তাহাদের সকল জড় বাসনার অবসান হইয়া আত্মায় তৃপ্তি নামিয়াছে। সে সম্বন্ধ লাভের পথ আল্লাহ্-তা'লার বন্দেগী। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন।

و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

অর্থাৎ "এবং আমরা জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করি নাই, পরন্তু আল্লাহ্-তা'লার এবাদতের জন্য"। (ছুরা জারিয়াত, ২য় রুকু।)

الا بذكر الله تطمئن القلوب

(সুরা রা'দ—২৯ আয়েত)

অর্থাৎ "জানিয়া রাখ আত্মার শান্তি আল্লাহ্-তা'লার স্মরনে" ইহা আমাদের যুগ যুগের অভিজ্ঞতা যে, আল্লাহ্-তা'লার এবাদত ও তৎ সাহায্যে আল্লাহ্-তা'লাকে লাভ করিতে থাকার মধ্যে, মানবের পার্থিব চাওয়া থামিয়া যায়। মানুষ যখন বড় জিনিষের সন্ধান পায়, তখন ছোট জিনিষের মোহ তাহার কাটিয়া যায় এবং বড় প্রাপ্তির পর ক্ষুদ্রের জন্য তাহার আর কোন স্পৃহা থাকেনা। আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভের পথে খাড়া হওয়ার সহিত পার্থিব আকর্ষণ শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া পরিণামে মানুষের আত্মা জড়ের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। জগতে যত ধর্মগুরু আসিয়াছেন,

যথা নবী, রসুল বা অবতার এবং যাহারা তাহাদিগের পূর্ণ অনুগামী হইয়াছে, পার্থিব বাসনা কামনার অবসান ঘটিয়া তাঁহারা শান্ত আত্মা লইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেক কর্ম্মানুশীলনে মরণকে স্মরণ করেন, অথচ তাঁহারা মরণে ভীত নহেন। কিন্তু যাহারা দুনিয়াতে মন বাঁধিয়াছে তাহারা সতত মরণ-ভোলা অথচ মরণ-ভীত। যাহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক তাহাদিগের জন্য পার্থিব জীবন অমর লোকের পথে আড়াল স্বরূপ। এ আড়াল কাটাইবার দ্বার মৃত্যু। মৃত্যু তাহাদিগের জন্য বিভীষিকাময় নহে, পরন্তু তাহাদিগের জন্য সুন্দর, কল্যাণময়। ইহাকে তাহারা শেষ হওয়ার ব্যবস্থারূপে দেখে না, পরন্তু ইহা তাহাদিগের জন্য প্রকৃত অমর জীবনের সিংহদ্বার স্বরূপ। ইহা তাহাদিগের মনে ভীতি জাগায় না, পরন্তু ইহার কথা তাহাদিগের মনে সেই চির অরূপের রূপ দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা জাগায়। সাধারণ মানুষ একদিকে মৃতকে না দেখিয়া মরণ-ভীত এবং পরে সৎকর্ম্মশিথিল ও মরণ-ভোলা। কিন্তু প্রকৃত খোদাভক্তগণ একদিকে মৃতকে না দেখিয়া সতত মরণ স্মরণকারী ও অপর দিকে অমর জীবনানন্দের আশা ও আগ্রহে সদা সৎ-কর্ম্মশীল। সুতরাং আল্লাহ্-তা'লা মানব মনে যেমন মরণ ভয় ও অমরত্বের পিপাসা দিয়াছেন, তেমনি ইহলোকেই মরণ ভয় নিরশন ও অমরত্বের পিপাসা শান্তির ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

জড় বিনাশশীল, সেই জন্য উহার বিন্দুতে বিন্দুতে মৃত্যুদূত বসিয়া সদা মরণশঙ্কা জিয়াইতেছে। তাই মানবের আত্মা জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া মরণ ছায়ায় অভিভূত। আবার জড়ের বিনাশশীলতার জন্য, জড় মোহজনিত বাসনা সমূহ মরণ-ভীতি দ্বারা রচিত। ঈদৃশ ভাবে ইহজীবনের পাকে আত্মা জড়দেহ ও শতশত জড়-বাসনার মোহবেষ্টিত হইয়া দ্বিবিধ মরণ ছায়ায় পরিবেষ্টিত।

জড় ও জড়ের বাসনা, মানুষের মনকে আকর্ষণ করে; এই দুইয়ের বেড়াজালে মানুষ মরণভীত। কিন্তু জড়ের অনন্ত প্রবাহ ও মানব অন্তরের সীমাহীন বাসনার মধ্যে অসীমের ডাক অবিনশ্বর আত্মার কর্ণে সদা গুঞ্জরমান; তাই সে মরণভোলা। যাহারা জড় ও জড়ের বাসনাতে জড়াইয়া যায় তাহাদের আত্মা অসীম জীবনের স্পর্শ ও আলো হইতে বঞ্চিত থাকায়, সদা মরণভীত। কিন্তু যাহারা সেই অসীমের সুরে সাড়া দিয়া জড় ও জড়ের বাসনার মৃত স্বরূপকে সতত স্মরণ করিয়া জড়মোহের উর্দ্ধে উঠিয়া যায় তাহাদিগের অন্তরে অমর জীবনের ফল্গু প্রবাহিত হয়। তাহারা মরণ ভয়হারা।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানব জীবিত ও তাহার মন জড়ের মোহে আকৃষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার মরণের ভয় সতত লাগিয়া থাকে। যাহার মন জড়ের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, মরণ-ভীতির আভ্যন্তরিক শৃঙ্খল জাল তাহার মন হইতে খসিয়া পড়ে

এবং ওপর হইতে অমর জীবনের আলোক সম্পাত হইয়া তাহার মরণ ভীতি চলিয়া যায় এবং তাহার আত্মা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ইহলোকেই সে ওপার হইতে আসা অমর জীবনান্দের ঢেউয়ের স্পর্শে বিভোর হয়। এই অবস্থাকেই হাদীস শরীফে موت قبل الموت। অর্থাৎ, 'মরার আগেই মরিয়া যাও বলা হইয়াছে। তাহার আনন্দের পূর্ণ-বিকাশ হয় তাহার মরণে। মৃত্যু আসিয়া যখন তাহার জড়দেহের বাহ্যিক পোষাকও খুলিয়া ফেলে, তখন জড়দেহ ধারণ জনিত ভয়ের রেশ, তাহার মনের কোণে যাহা কিছু থাকে, তাহা শেষ করিয়া দেয়। সে তখন দ্বিবিধ মৃত্যু ছায়ার বেষ্টন হইতে মুক্ত। আত্মা তাহার অবিনশ্বর মৃত্যু তাহাকে অমরত্বের পোষাকে ভূষিত করিয়া অনন্ত জীবনের পথে ধাবমান করিয়া দেয়। ইহলোকে যাহারা জড় বাসনায় আবদ্ধ, মরণ আসিয়া যখন তাহাদিগের জড়দেহের পোষাক খুলিয়া দেয়, তখন আত্মার উপর হইতে তাহা-দিগের দেহ জনিত মরণ ভীতির বহিরাবরণ খসিয়া পড়ে। কিন্তু বসনা জনিত অন্তরাবরনের দুরপনেয় প্রভাব তাহাদিগের আত্মাকে বেষ্টন করিয়া অমর জীবন পথে তাহাদিগের যাত্রাকে ব্যহত করে।

যাহারা নাস্তিক তাহারা বলিবে, ধর্ম কথার প্রভাব অহিফেনের ন্যায় ধার্মিকের মনকে মিথ্যা শান্তির নির্জীব ঘুমের মায়ায় বিভোর করিয়া দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এই শান্তির প্রকৃত স্বরূপেরই আলোচনা করিব।

পরকাল বলিয়া কিছু আছে কি? পর-কালের পর মানুষের কি হয়? সে কোথায় যায়? মানব জীবনের জন্য, এ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টির আদি হইতে মানবের মনকে যে সকল প্রশ্ন আকুল করিয়াছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রশ্নের পরেই মৃত্যুর পর পারের জীবনের প্রশ্নের স্থান। জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যাইবে, সকল জাতির মধ্যেই অধিকাংশ লোক এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বাসের দাবী করে। কিন্তু পরীক্ষা করিলে অল্প সংখ্যক লোকের বিশ্বাসই যুক্তিতে টিকিবে। তাহাদিগের বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে কোন মিল পাওয়া যায় না। পরলোক থাকিলে পরলোকের জন্য ইহজীবনে যে পথে মানুষের চলা উচিৎ, তাহা অধিকাংশ লোকেই করে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন,

و من الناس من يقول امنا بالله و باليوم الاخر و ما هم بمومنين

"এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই দাবী করে 'আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী,' কিন্তু তাহারা মোটেই বিশ্বাসী নহে।" (সুরা বকর, ৯ আয়েত)। পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষকে প্রতি নিঃশ্বাসে দায়িত্বশীল ও সৎকর্মশীল করিতে বাধ্য। পরকাল থাকিলে মানব জীবনের ধারা একভাবে প্রবাহিত হইবে এবং না থাকিলে তাহার জীবন ভিন্ন আকার ধারণ

করিতে বাধ্য। পরকালে অবিশ্বাস এবং যদি সত্যই পরকাল না থাকে, তাহা হইলে মানুষ সমাজের সমস্ত আইন কানুন ভাঙ্গিয়া অচিরে উদ্দেশ্যবিহীন, দায়িত্ব জ্ঞান শূন্য উচ্ছৃঙ্খল পশুতে পরিণত হইতে বাধ্য। যাহার কোন গন্তব্যস্থল নাই, কাজের কোন হিসাব নিকাশ ও ফলাফল ভোগ নাই, তাহার জন্য আইন কানুন বাধাবন্ধন এবং পাপ পুণ্যের কোন বালাই নাই। এরূপ হইলে মানবের জীবন অবান্তর হইয়া পড়ে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন ঃ

افحسبتم انما خلقنكم عبثا و انكم
الينا لا ترجعون

"তোমারা কি মনে করিয়াছ, আমরা তোমাদিগকে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমাদিগের দিকে ফিরিয়া আসিবে না।" (সুরা আল-মুমেনুন, ১১৬ আয়েত)। পক্ষান্তরে পরকাল থাকিলে মানব জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তাহাকে এক শৃঙ্খলাযুক্ত শান্তিপূর্ণ জীবন পথে পরিচালিত করিতে বাধ্য। আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন,

ان الذين امنوا و الذين هادوا
و الصبئون و النصرى من امن بالله
و اليوم الاخر و عمل صالحا فلهم
اجرهم عند ربهم - و لا خوف عليهم
و لا هم يحزنون -

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, যথা ইহুদী, সাবী ও খ্রীষ্টান, ইহাদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী তাহারা ভীত হইবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।"

(সুরা মায়েদা, ৭০ আয়েত)

উচ্ছৃঙ্খলাতার পরিনামে ভীতি ও দুঃখ আসে এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলার পরিনামে ভীতি ও দুঃখের অবসান ঘটিয়া শান্তিলাভ হয়। কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা তখনই আসিতে পারে যখন তাহার কাজের হিসাব নিকাশ ও ফলাফল ভোগ সুনিশ্চিত এবং এ সম্বন্ধে তাহার সক্রীয় বিশ্বাস থাকে। এইরূপ সক্রীয় বিশ্বাসের পরিনামেই সকল ভয় তথা বিনাশ প্রাপ্তির ভয়ের নিরসন ও অমর জীবনের ব্যবস্থালাভ ঘটিয়া আত্মা শান্ত হয়। কিন্তু সত্যই যে পরলোক আছে এবং মানুষের জন্য কি প্রকারের শান্তি আছে তাহা কি ভাবে জানা যাইবে?

যেহেতু মরণের ওপার হইতে আজও কেহ সেখানকার খবর দিতে দেহ পরিগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই, সুতরাং উভয় পারের মালিক বিশ্বপতি আল্লাহ্-তা'লার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন ব্যতিরেকে পরলোকের অবস্থা জানিবার উপায় নাই। ইচ্ছাময় সৃষ্টিকর্তা উভয় লোকের মধ্যে যে অভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া রাখিয়াছেন, সে প্রাচীরের অপর পারের সংবাদ জানা সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতিরেকে অসম্ভব। তিনি পরলোকের সম্মুখে মহা আবরণ টানিয়া

দিয়া প্রত্যেক বস্তুর মধ্য হইতে আত্মাকে অসীমের সুরে ডাক দিয়া অজানা লোকের সন্ধানে তাহারই স্মরণ লইতে বলিয়াছেন। যাহাদের জ্ঞান শুধু এপারেই সীমাবদ্ধ, তাহাদের চিন্তার ধারা ওপারের লৌহ কপাটের অন্ধকারে আছাড় খাইয়া প্রতিহত হইয়া গভীরতর অন্ধকার লইয়া ফিরিয়া আসে।

যাহারা ওপারের আলো ছাড়া, এপারের সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া, ওপারের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে তাহারা শুষ্ক দার্শনিক। আল্লাহ্-তা'লার সহিত তাহাদিগের কোন সম্বন্ধ না থাকায়, ওপার সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা যাহা কিছু বলে সকলই আন্দাজ, সকলই কাল্পনিক, শুধু অন্ধকার। ওপরের সহিত সম্বন্ধহীন হওয়ার কারণে দর্শন বা দার্শনিক, কোন কিছু বলার অধিকারী নহে। না জানিয়া বা না দেখিয়া কোন কিছু বলা অনধিকার চর্চ্চা ছাড়া আর কিছুই নহে। ফলে দার্শনিকগণ নিজেরাও ভ্রান্তির গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়া তলাইয়া গিয়াছে এবং জনসাধারণের জন্যও তিমির সাগরে ডুবিয়া মরিবার পথ করিয়া গিয়াছে। সুতরাং শুষ্ক দার্শনিকদিগের পুস্তকে পরলোকের সন্ধান পাওয়া মরীচিকায় জল লাভের আশাতুল্য।

একমাত্র ঐ সকল মণীষীর নিকট হইতে পরলোকের তথ্য পাওয়া সম্ভব যাঁহারা আল্লাহ্ তা'লার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মানব জাতির ধর্মগুরু, নবী, রসুল বা অবতার। তাঁহারা বাসনার ডাকে সাড়া না দিয়া যাঁহার ডাকের প্রতিধ্বনি বাসনার মাঝে বাজিয়াছে, সেই আদি ডাকে তাঁহারা সাড়া দেন এবং সেখান হইতেই তাঁহারা পরলোকের তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। তাঁহারাই আপন আপন যুগে ওপারের জীবন সম্বন্ধে আলোক সম্পাত করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন।

যুগের অগ্রগতির সহিত মানবের জ্ঞান যত বাড়িয়া গিয়াছে, আল্লাহ্-তা'লা পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞানও তদ্রূপ তাঁহার প্রেরিত পুরুষদের মারফৎ মানবকে বর্দ্ধিত আকারে দিয়া আসিতেছেন। ইসলামের মধ্যে ইহা চরম আকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) উহার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আধ্যাত্মিক স্তরে যাঁহারা চলা ফেরা করেন তাহাদিগের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দর্পণে বিষয়টি প্রাঞ্জল, সমুজ্জল ও মনোরম!

মৌলানা রুম বলিয়াছেন—

آنجهان و راهش ار پیدا شدے
کم کسے در ایں جہان اک آن بدے

অর্থাৎ, যদি পরলোক ও উহার রাস্তা খুলিয়া যাইত, তাহা হইলে অল্পলোক এক মূহুর্তের জন্য এ জগতে অবস্থান করিত।

(ক্রমশঃ)

বাত্যাবিধ্বস্ত এলাকায় সর্বহারাদের সাহায্যার্থে প্রাদেশিক মজলিশে খোদ্দামূল আহমদীয়া, পূর্ব পাকিস্তান

মজলিশে খোদ্দামূল আহমদীয়ার স্বেচ্ছা-সেবকরা বাত্যাপীড়িত এলাকায় দুঃস্থ মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। মজলিশের পক্ষ হইতে চাটগাঁয়ে একটি সাহায্য শিবির খোলা হইয়াছে এবং সেখানে রীতিমত রিলিফের কাজ চালু রহিয়াছে। তাহারা ঢাকা, চাটগাঁ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ইত্যাদি এলাকা হইতে নূতন ও পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করিয়া চাটগাঁয়ের দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করিতেছে। মজলিশে খোদ্দামূল আহমদীয়ার কর্মীরা উপদ্রুত এলাকায় ঔষধ বিতরণ, টীকা দান ও ইনজেকশন দেওয়ার কাজও করিতেছে।

কেন্দ্রীয় মজলিশে খোদ্দামূল আহমদীয়া রাবওয়া (পশ্চিম পাকিস্তান) ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে বিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্যের জন্য ১০০০৲ (এক হাজার) টাকা প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আমীর হজরত মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব ও প্রাদেশিক

কায়েদ মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব উপদ্রুত এলাকা সফর ও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দ্বারা পরিচালিত রিলিফ কার্য্য পরিদর্শন করার পর ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গত ২৮ শে মের মহা-প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রাদেশিক আমীর সাহেবের নির্দ্দেশক্রমে ঢাকার কায়েদ সহিদউর রহমান সাহেব উপদ্রুত এলাকা সফর করিয়া দুর্গতদের মধ্যে সেবা-কার্যের রিপোর্ট প্রদান করেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া (রাবওয়া) বাত্যাপীড়িতদের মধ্যে সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তান রিলিফ ফাণ্ডে ৬০০০৲ (ছয় হাজার) টাকা দান করিয়াছেন।

ইতি খাকছার
সহিদউর রহমান

আহ্‌মদীয়া মতবাদ কি? যদি জানতে চান; তবে প্রশ্ন করুন ও বইয়ের জন্য লিখুন নিম্ন ঠিকাকানায়—

৪ নং বক্সিবাজার রোড ঢাকা—১

রাবওয়াহ্‌
জিলা—ঝঙ্গ
পাঃ পাকঃ

আমেরিকার পত্র

দুই জন খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ।

The American Fazl
Mosque.
25-5-63 C. E

My dear brother,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার ১৮ | ৪ | ৬৩ তারিখের পত্রখানা পাইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। জাজাকুমুল্লাহ আহসানুল জাজাহ। ব্যস্ততার দরুন উত্তর দানে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

আহ্‌মদী পত্রিকায় আমার আমেরিকায় আসার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া এবং জুমার খোৎবায় দোয়ার জন্য এলান করিয়াছেন শুনিয়া বড়ই বাধিত হইলাম, আল্লাহ্-তা'লা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন; আমিন।

বর্তমান মাসে, খোদা-তা'লার ফজলে দুই জন আমেরিকান যুবক আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করিয়াছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। দোয়া করিবেন, আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাদিগকে এস্তেকামাত এবং রূহানী তরক্কী দান করেন এবং তাঁহাদিগকে আরো অনেক আহ্‌মদী হইবার জরিয়া বানান, আমিন।

আমি প্রত্যহ সকাল বেলায় একজন নও-মোসলেমকে কোরআন পাঠ এবং নামাজ শিখাই। অতঃপর প্রায় প্রত্যহই সহরে ঘুরি এবং পুস্তিকা বিতরণ করি। এপর্যন্ত প্রায় তিনশত ট্রাকট্ ও পামপ্লেট বিতরণ করিয়াছি।

পাকিস্তান, নেপাল ও ইণ্ডিয়ান এম্বেসীর কতিপয় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সিলসিলা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনাও হইয়াছে এবং তাহাদিগকে পুস্তক—পুস্তিকাও বিতরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে পাকিস্তানের নেশনেল এসেম্বলির স্পিকারের সেক্রেটারী শামছুদ্দিন সাহেব, পাকিস্তান কালচারেল এনেক্সির ইনচার্জ

ডাঃ এস, এ, খান এবং ইণ্ডিয়ান এমবেসির মিঃ হরিভজন সিং এর নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ খানের বাড়ীতে একদিন আমাদের মিশন ইনচার্জ সুফি আবদুল গফুর সাহেব এবং খাকছারের দাওয়াত ছিল। অতপর একদিন এমবেসীতে যাইয়া তাঁহার অফিসে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি এবং আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলোচনা করি। তাহাকে 'আহ্‌মদীয়াত বা প্রকৃত ইসলাম পুস্তকখানা উপহার দেই। তিনি তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গত সপ্তাহে আমাদের সাপ্তাহিক মিটিংএ "Life after death" সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা ছিল। উক্ত মিটিংএ কয়েকজন গন্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ইণ্ডিয়ান এমবেসীর জনৈক কর্ম্মচারী মিষ্টার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এবং জনৈক আমেরিকানের নাম উল্লেখযোগ্য।

দোওয়া করিবেন এবং সকল ভ্রাতাগণকে দোয়ার বিনীত নিবেদন জানাইবেন। ছাদেক মিয়াকে আমার ছালাম ও দোওয়া জানাইবেন। و السلام

খাকছার

A. R. khan.

[বাংলার আহ্‌মদীগণ 'আহ্‌মদীর' প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য স্মরণ করিবেন এবং প্রবাসী ভ্রাতার প্রতি কর্তব্যও স্মরণ রাখিবেন।]

—[সম্পাঃ আহ্‌মদী।]

প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক জাহানে নও পত্রিকায় "তেরজন কাদিয়ানী তৌবা করে মুসলমান হয়েছে" শীর্ষক একটি মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদে বলা হয়েছে যে খুলনা জেলার হরিনগর গ্রামের তেরজন আহ্‌মদী নাকি তৌবা করে আহ্‌মদীয়ত বা প্রকৃত ইসলাম পরিত্যাগ করেছে। সংবাদে আরো বলা হয়েছে যে, সেখানকার চেয়ারম্যান, জনাব সামছুর রহমান সাহেব নাকি নানাবিধ প্রলোভন দেখিয়ে সেই এলাকার লোকদিগকে আহ্‌মদীয়া মতবাদে দীক্ষিত করছেন। আমি এই মিথ্যা, ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যমূলক কল্পিত সংবাদটির প্রতিবাদ করে প্রকৃত ঘটনাটি জনসাধারনের সম্মুখে তুলে ধরছি।

বিগত এপ্রিল মাসে হরিনগর গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে এক ওয়াজ মহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়াজে মৌলবী মুস্তফা মাহমুদ ও হাতেম রাশেদী সাহেব মাদ্রাসায় অধিক ছাত্র ভর্তি করাইবার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান এবং উক্ত এলাকার সুন্দরবন হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী জনাব সামসুর রহমান চেয়ারম্যান সাহেব, হাইস্কুলের হেডমাষ্টার জনাব আলী বিএ. বি. টি. এবং শিক্ষক জনাব মহাম্মদ ইব্রাহিম বি, কম সাহেব আহ্‌মদী থাকার জন্য, জনসাধারণকে উক্ত হাই স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তি না করিয়া নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটিতে ছাত্র ভর্ত্তি করিবার জন্য নছিহত খয়রাত করেন। অতঃপর আহ্‌মদী শিক্ষক জনাব ইব্রাহিম সাহেব মৌলবী সাহেবদের এই উপদেশের মুখোস খুলে উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন এক কালে মুসলমানগণ মৌলবীদের ফতওয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে ইংরেজী শিক্ষাকে বর্জন করে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। পুনরায় মৌলবী সাহেবদের কথায় বিশ্বাস করে হাই স্কুল বর্জন করলে পূর্বের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে। ইহার ফলে মৌলবী সাহেবগণ রাগান্বিত হইয়া আহ্‌মদী ও আহ্‌মদীয়া জমাতের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অশ্লীল গালি গালাজ এবং ফতওয়া দিতে থাকেন। এই সভায় তের জন লোকের আহ্‌মদীয়াত ত্যাগ করা দূরের কথা মৌলবী সাহেবগণ নিজেরাই জন সাধারণের শ্রদ্ধা হারিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে খোদার যজলে মৌলবী সাহেবানদের

ফতওয়া বাজীর পর উক্ত হাই স্কুলে বহু সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি হয়েছে। কেহ ইচ্ছা করিলে স্কুলে যেয়ে যাচাই করে দেখতে পারেন সব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ছাত্র সংখ্যা অনেক বেশী। জনাব সামসুর রহমান সাহেব প্রভাব খাটিয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে আহ্‌মদী করে নিচ্ছেন বলে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক। এই এলাকায় যে সকল লোক আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করেছেন তাহাদের প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন। উক্ত এলাকার অশিক্ষিতগণই আহ্‌মদীয়াতে শামিল হন নাই। ইহা দ্বারা এই কথাই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয় যে জনাব চেয়ারম্যান সাহেব জন সাধারণের উপর কোন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। পক্ষান্তরে শিক্ষিত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ আহ্‌মদীয়ত গ্রহণ করায় জনাব চেয়ারম্যান সাহেবের চারিত্রিক প্রভাব ও আহ্‌মদীয়তের শিক্ষার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

প্রকাশ থাকে যে উক্ত সভায় মাত্র একজন জমাতে ইস্‌লামীর মৌলবী ছিলেন। তিনি অপর মৌলবীগণের কাহিল অবস্থা দেখে স্বয়ং মুখ খোলার চেষ্টা পর্যন্ত করেন নাই।

জাহানে নও পত্রিকার সংবাদ দাতার যদি সাহস থাকে তাহা হইলে যে ১৩ জন মুরতেদ হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন তাহাদের নাম কাগজে লিখিয়া প্রকাশ করুন। নচেৎ জগত জানিবে যে সংবাদ দাতা মিথ্যাবাদী। তাহাকে ইহাও জানাইয়া দিতেছি যে উল্লেখিত ঘটনার পর অদ্যাবধি উক্ত স্থানে আল্লাহ্-তা'লার ফজলে আরও ১২ জন পবিত্র আহ্‌মদীয়া সেলসেলায় দাখিল হইয়াছে।

আবু তাহের
প্রাদেশিক মুরব্বী সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

১৫।৬।৬৩ সন

প্রার্থনা

আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল

সমস্ত প্রশংসা ধরে,
বিশ্বপালক মহান প্রভু ;
দাতা দয়ালু তিনি,
বিচার দিনের বিভু।
তোমারই চাই সাচিব্য,
তোমারই করি উপাসনা ;
সরল পথ আমারে দেখাও,
অভিশপ্ত পথ না।
সেই পথে আমারেও চালাও,
ওহে মহান ;
যে পথের পথিকেরে,
করেছ অনুগ্রহ দান।
সেই পথে নয়,
যে পথের পথিক অভিশপ্ত ;
আর তোমারে ছাড়িয়া যারা,
হল পথভ্রান্ত।

[সূরা-'ফাতেহা অবলম্বনে]

খবর

শোক সংবাদ

(১)

আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় নাটোরের জনাব আবুল আসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব আর ইহ-জগতে নাই। আহ্‌মদীয়তের বার্তা শোনা মাত্র যে সব সাধুপ্রাণ উড়িয়া আসিয়া ইহাতে যোগদান করেন এবং ইহাতেই যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এবং বাংলার অতি প্রাচীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তিনি সুকবি ছিলেন। 'আহ্‌মদীয়তের' প্রতি আহ্বান পূর্বক ইস্‌লামের নব-জাগরণের উদ্দেশ্যে বহু কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। যথা সম্ভব ১৯১৫ সনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুণ্যশ্লোক খাঁ বাহাদুর আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী সাহেব মরহুমের বয়আতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আহ্‌মদীয়ত কবুল করেন। মরহুম মুছি ছিলেন। আল্লাহ্-তা'লা জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁহার দরজা বুলন্দ করুন। আমীন।

আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহার উত্তম আদর্শে কায়েম রাখিবার তৌফিক দিন এবং তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান আহ্‌মদী করুন। আমীন।

আমরা তাঁহার সমগ্র পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি। কিছু দিন পূর্বে তাঁহার ছোট ভাই জনাব আবুল কাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেবও ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না লিল্লাহে রাজেউন'। 'আহ্‌মদী'তে সে সংবাদ পরিবেশিত হইতে পারে নাই বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার মগফেরাত করুন। আমীন।

(২)

মুনসি ময়েযউদ্দীন সাহেব তারুয়ার (ব্রাহ্মনবাড়ীয়া) একজন মুখলিস্ প্রাচীন আহ্‌মদী ছিলেন। তিনি ৬০ বৎসর বয়সে বয়য়াত করেন এবং ৮৭ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না লিল্লাহে রাজে-উন। তিনি কোন স্কুল বা মক্তবে পাঠ করেন নাই। কিন্তু তিনি মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার মোকাবিলায় বড় বড় আলেম থ হইয়া যাইতেন। তাহার তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির জন্য জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আসে পাশে, অনেক দূর পর্যন্ত মানুষ তাঁহাকে বিবাদ মীমাংসার জন্য ডাকিয়া লইয়া যাইত। আল্লাহ্-তা'লা তাহার রুহের মাগফিরাত করুন এবং জান্নাতের উচ্চস্থানে তাঁহাকে আবাস দিন। আমীন!

(৩)

ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক 'সম্পর্ক ও আইনের' ছাত্র জনাব এ, কে, এম শহিদুল্লাহ একবাল হলে তাঁহার কক্ষে বৈদ্যুতিক তারে তড়িতাহত হইয়া গত ১০ই জুন সোমবার সকালে এন্তেকাল করেন।

(ইন্না লিল্লাহে.....রাজেউন।)

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত চকোরিয়া থানার কৈয়ারবিল গ্রামের তিনি অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পরিবারে তিনিই একমাত্র আহ্‌মদী ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত মুখলেস্ ও কর্মী যুবক ছিলেন। আল্লাহ্-তা'লা পরলোকে তাঁহার আত্মাকে বিশেষ অনুগৃহীত করুন। আমীন।

শাদী মুবারক

জনাব এ, কে, এম, নূরুদ্দীন সাহেব সংবাদ দিতেছেন যে ১২ই মে, রবিবার তাঁহার এক মাত্র ছোট ভাই, ময়মনসিংহ নিবাসী মৌলবী হাশিমউদ্দিন সাহেবের পুত্র এ, কে ছলিমউদ্দিন আহমদের শুভ পরিণয় খুলনা নিবাসী সৈয়দ আবদুল ওদুদ সাহেবের ১মা কন্যা ছৈয়দা শামিমা খাতুনের সহিত কন্যার পিতৃ ভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মৌলানা মহিবুল্লাহ সাহেব বিবাহ পড়ানোর কাজ সমাধা করেন।

সমস্ত আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট তাঁহার অনুরোধ যেন তাঁহারা আল্লাহ্‌র সমীপে এই দোয়া করেন যে নব দম্পতি যেন ইসলাম অর্থাৎ আহ্‌মদীয়াতের সেবা করিতে পারে। আমীন।

দরুদ পাঠের জরুরত

মৌলবী মোহাম্মদ

দরুদ এক প্রকার দোয়া। ইহার ভাবার্থ এই যে, "হে আল্লাহ্! হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং তাহার বংশধরগণকে যেমন আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কল্যাণ দিয়াছ তেমনি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও তাহার অনুগামীগণকে দাও।"

১। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি তাহাদিগের মধ্যে আবির্ভূত নবীকে খোদার আসনে বসাইয়াছে। দরুদ পাঠ সদাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে হযরত নবী করিম (সঃ) আল্লাহ্ নহেন। সুতরাং দরুদ পাঠের ব্যবস্থা দ্বারা ইস্‌লামে শিরকের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে পীর ফকির, ওলি, দরবেশ, আলেমও হযরত রসুল করিম (সঃ) এর অধীন হওয়ায়, পূজা বা পূজা-সম ভক্তি পাইবার যোগ্য নহেন।

২। আল্লাহ্-তা'লা মানুষকে কৃতজ্ঞতাশীল করিয়াছেন। অকৃতজ্ঞ মানুষ পাষাণের ন্যায়। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মানব জাতির সর্ব শ্রেষ্ঠ হিতৈষী। দরুদ পাঠের ব্যবস্থা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-হিতৈষীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

৩। কোন গুণী পুরুষের মধ্যে সৎগুণরাজি দেখিয়া কাহারও পছন্দ হইলে এবং উহা সতত স্মরণ করিলে, মনস্তত্ব বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী সে গুণী ব্যক্তিকে সতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অনুকরণ করিয়া থাকে। আমরা যখন হযরত রসুল করিম (সঃ) এর গুণাবলি স্মরণ করিয়া দরুদ পাঠ করি, তখন স্বাভাবিক ভাবে সেই গুণ গুলির অনুশীলন করার প্রেরণা পাই এবং আমাদিগের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিরাগী জগত অনুরাগী হয়।

৪। হযরত রসুল করিম (সাঃ) মানব হওয়ার কারণে তিনি অসীম আল্লাহ্-তা'লাকে লাভ করা শেষ করেন নাই। দরুদ পাঠে আমরা একদিকে তাঁহার পরলোকে ক্রম আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনা করি ও ইহলোকে তাহার প্রবর্তিত ইসলাম, ধর্ম জগতে, এক মাত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, যাহা এখনও হয় নাই, কামনা করি, যেন ইহা তাঁহার অনুবর্তীদের দ্বারা হয়।

৫। দরুদ পাঠের ফলে শুধু হযরত রসুল করিম (দঃ) এর উপরই কল্যাণ বর্ষিত হয় না পরন্তু তাঁহার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক বংশধরদের উপরও কল্যাণ বর্ষিত হয়। দরুদ পাঠকারী হযরত রসুল করিম (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক ওয়ারিশ হিসাবে যোগ্যতানুযায়ী নিজেও এই কল্যাণের অংশ লাভ করে।

সুতরাং দরুদের মধ্যে চাওয়া কল্যাণের আঁচল হযরত রসুল (সাঃ) কে কেন্দ্র করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সমভাবে প্রসারিত।

অতএব দরুদের কল্যাণ ব্যক্তি, পরিবার, জাতি, ও জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিতে সক্ষম।

অনুগ্রহ পূর্বক 'আহ্‌মদী'র চাঁদা যাঁহার বকেয়া আছে, পরিশোধ করুন ; 'আহ্‌মদীর' নূতন গ্রাহক দিন।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে. সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।